



৩৯ বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

সূচিপত্র

আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
বন্যা কিছুটা মনুষ্যকৃত	তপোব্রত সান্যাল	৫
স্মারক-বক্তৃতার ছবি		৯
যুক্তি তক্কো ট্র্যাডিশন	চিত্ত সামন্ত	১০
জন্মশতবর্ষে দেবীপ্রসাদ	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১২
বেনিয়া-শিরোমণি রামদেব	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১৩
মানুষ-এর প্রতিপালক	পবন মুখোপাধ্যায়	১৫
হৃদয়ের সুরক্ষার পথ	গৌতম মিস্ত্রি	১৬
বিষ যখন ধূপের ধোঁয়ায়	অর্ণব ঘোষ	২২
শানেল-দিয়র-এর দেশ	তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী	২৪
পরিবেশবান্ধব গাড়ি	নন্দগোপাল পাত্র	২৭
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	২৯
চিঠিপত্র		৩১
পুস্তক পরিচিতি		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ /৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanus@gmail.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: <http://www.facebook.com/utsomanus/>

প্রতিষ্ঠাতা-দপ্তরী নিবারণদা প্রয়াত

প্রথমে পত্রিকা সম্পর্কিত কয়েকটি কথা বলার। দেখতে দেখতে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দশম বর্ষে। এবারে বক্তা ছিলেন নদীবিশেষজ্ঞ তপোব্রত সান্যাল। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম কর্তৃপক্ষ এবারেও তাঁদের আলোচনাক্ষম্টি ব্যবহার করতে দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। সূচনা সঙ্গীতে ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী কাবেরী রায়। চমৎকার গাইলেন। আমরা তাঁর কাছেও ঋণী রইলাম। পূর্ব ঘোষণা মতো সেদিনই প্রকাশিত হল ‘বাঁধ বন্যা বিপর্যয়’ সঙ্কলন গ্রন্থটি। যার মূল কৃতিত্ব ঝিল্লি বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়কালী প্রেস কর্তৃপক্ষের। দেবাশিস রায় চমৎকার প্রচ্ছদও করে দিয়েছেন। বন্যা নিয়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বেগ ছিল ভীষণ। তাই বছবার বেরিয়েছে বন্যা সঙ্কলন। সেগুলো থেকেই বাছাই করে এই বই। আর তা প্রকাশের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল গুঁর স্মারক বক্তৃতা মঞ্চকেই। বইটি প্রকাশ করলেন তপোব্রতবাবু। তারপর স্লাইড সহযোগে ‘বছর বছর বন্যা— এই বিপর্যয় কি আদৌ ঠেকানো যাবে?’ নিয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। তপোব্রতবাবু কলকাতা বন্দর থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক উচ্চপদে কাজ করেছেন। বিশ্বের নানা দেশের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ দেখে এসেছেন। তাই নদী, বন্যা ইত্যাদি নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতাও বিপুল। গুঁর বিশ্লেষণী বক্তৃতার পর শ্রোতাদের প্রমোত্তরে জমে ওঠে

বইমেলায় উৎস মানুষ

স্টল নং ১২৬

লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নের উল্টোদিকে
প্রকাশিতব্য বই চেনা বিষয় অচেনা জগৎ

আলোচনা। অনুষ্ঠান সুপরিচালনা করলেন শ্যামল ভদ্র। পত্রিকা-পাঠকদের জন্য একটা খারাপ খবরও আছে। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন এক দশক আগে। সদ্য প্রয়াত হলেন নিবারণ সাহা। উৎস মানুষের প্রতিষ্ঠাতা-দপ্তরী। ওঁর এক চিলতে ঘরেই ছিল পত্রিকার সূতিকাগার, পালনকক্ষ। চলতি লবজে ক্রেণ্ডও বলা চলে। আপাত কাটখোঁটা, পয়সাসর্বস্ব মানুষটির পত্রিকা সম্পর্কে ছিল অসীম দরদ। কেন জানি না, একে নিবারণদা ব্যবসায়িক সম্পর্কের বাইরেই রেখেছিলেন। তাই শুরু দিকে ওঁর একচিলতে ঘরে যখন সন্ধেবেলায় গিয়ে দশ-বারোজন দাপাদাপি করতাম, চিৎকার-তর্ক হত, নিবারণদা উপভোগ করতেন। চা-মুড়ি, তেলেভাজার জোগান দিতেন। ওঁর যে অন্য কাজের বারোটা বাজছে, তা গায়ে মাখতেন না। হাতে বেশি সময় নেই, পত্রিকা বা বই বার করতে হবে, তার জন্য জোঁরাজুরি করলে রেগে পূর্ববঙ্গীয় টানে দু-কথা শোনাতে ন্য যে তা নয়। কিন্তু ওঁর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কাজটা ঠিক সময়ে উতরে দিতেন। প্রয়োজনে রাত জেগেও। মেলার মাঠেও নিয়মিত হাজিরা দিতেন। ওঁর ঘরেই ডাঁই হয়ে থাকত পত্রিকা ও বইয়ের ছাপা ফর্মা। তা নিয়েও কোনো অনুযোগ ছিল না। দুর্দান্ত বাইন্ডার ছিলেন। পুরস্কারও পেয়েছিলেন। গর্ব করে বলতেড়ও সেকথা। বেশ কয়েক বছর অসুস্থতা ও নানা কারণে দেশে চলে যান। আমাদের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়। মাঝে একবার ওঁর প্রয়াণ-খবর রটে গিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে ভুল ভাঙে। এবার সত্যি সত্যিই এল দুঃসংবাদ। বিআইটিএম-এ চাকরি করতেন। সেখান থেকেই যাচিয়ে নেওয়া হল। অশোকদা, তারপর নিবারণদা চলে গেলেন— পত্রিকার একটা অধ্যায় হারিয়ে গেল। আমরা এক একান্ত আপনজনকেই হারালাম। এবার অন্য প্রসঙ্গে। কবির স্বপ্ন ছিল— ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। সবেতে না হোক কিছু ক্ষেত্রে তা সত্য হতে চলেছে। তার অন্যতম হল পরিবেশ দূষণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী দূষণজর্জর ১৫টি দেশের তালিকায় ভারত রয়েছে। আর কার্বন নিঃসরণে ভারতের স্থান চতুর্থ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানাচ্ছে, প্রতি আটটি মৃত্যুর একটি হচ্ছে বাতাস-দূষণের কারণে। হু-র জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ

বিভাগের অধিকর্তা মারিয়া নেইরার বক্তব্য, এক-একটা দেশে দূষণের কারণ এক-একটা। ভারতে সবচেয়ে বেশি দূষণ ঘটায় বর্জ্য পোড়ানো যন্ত্র, গাড়ি আর বিদ্যুৎ তৈরিতে ব্যবহৃত কয়লা। এদেশে কয়লা-পোড়ানো বিদ্যুৎ ৭৯ শতাংশ চাহিদা পূরণ করেছে। কয়লা-নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প ব্যবস্থার দিকে যাওয়া উচিত। নরওয়ে এ বিষয়ে দারুণ কাজ করেছে। ওরাও কয়লা-নির্ভর ছিল। কিন্তু ওরা খুব দ্রুত পুনর্নবীকরণ শক্তিতে সরে গেছে। এতে ওদের অর্থনীতির কিছুই হেরফের হয় নি। ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক তথ্য-পরিসংখ্যানকে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁরা করছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী। তাই তথ্য নস্যাত না করে দিয়ে সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। ভারতের নীতিনির্ধারকদের নরওয়ের মতো দেশকে দেখে শেখা উচিত। বিকল্প শক্তি উৎপাদনে খরচ বেশি, অনেকে এই যুক্তি দেখান। নেইরার বক্তব্য, ‘শুধু খরচ দেখলে হবে না, স্বাস্থ্যখাতে খরচও ধরতে হবে, ওটাও খুব বেশি।’ দূষণে দেশের রাজধানী শহর সব থেকে এগিয়ে। গর্বের কথা, মাঝে মাঝে আমাদের প্রিয় কলকাতা শহরও তাকে টেকা দিচ্ছে। এখনও প্রশাসকদের ঘুম ভাঙেনি। দিল্লি দূষণ কমাতে অনেক ব্যবস্থা নিচ্ছে। আর আমরা? না, থাক। জল অচিরেই দুর্মূল্য হয়ে উঠবে, বলছেন ভূবিজ্ঞানীরা। অথচ তার অপচয় বন্ধ করা নিয়ে আমাদের কোনো উদ্যোগ নেই। রাজেন্দ্র সিংকে জল-সংরক্ষণবাদী বলা হয়। উনি ম্যাগসাইসাই এবং স্টকহলম ওয়াটার প্রাইজও পেয়েছেন। জানাচ্ছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ জল-চিত্র খুবই খারাপ। জল সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতার অভাবের কারণে ৭০ শতাংশ ছোট নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্র ছোট নদীগুলোকে বাঁচাতে খুব ভাল কাজ করেছে। তারপর তেলেঙ্গানা আর কর্ণাটক। রাজেন্দ্র মতে, আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নদী-শিক্ষা (রিভাল লিটারেসি) আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। এই কাজে সাধারণ মানুষের যোগদানই সবচেয়ে কাম্য, কন্ট্রাস্টরদের নয়। রাজেন্দ্র যা বলছেন বলুন, আমরা ওঁর কথায় গুরুত্ব দিচ্ছি না। সাধারণ মানুষ সব করলে কন্ট্রাস্টররা কী করবে! নেতা-মন্ত্রীদেরই বা কী হবে!

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি পৃথিবী তবু ঘুরছেই: গ্যালিলিও

আশীষ নাহিড়ী

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীর আর্হিক ঘূর্ণনের কথা আভাসিত হয়েছিল। আর্হিভট এসে সুনিশ্চিতভাবে তা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, “তারকাময় আকাশ স্থির রহিয়াছে। পৃথিবীই ক্রমাগত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। এইভাবে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করিবার ফলেই তা তারকামণ্ডলীর এবং গ্রহসমূহের উদয় ও অস্ত ঘটায়।”’ শুধু তাই নয়, ‘সূর্যর বার্ষিক আপাত চলন এবং গ্রহসমূহের পর্যায়ক্রমিক গতির কথাও’ ভারতীয়দের জানা ছিল। বঙ্কিমের মোক্ষম প্রশ্ন: পৃথিবীর আর্হিক ঘূর্ণনের কথা তাঁরা জানতেন; সূর্যের বার্ষিক আপাতচলনের কথা তাঁরা জানতেন; এমনকি গ্রহগুলো যে নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে পাক খায়, তাও তাঁরা জানতেন। এই তিনটে ধারণাকে যোগ করলেই তো একটা সাধারণ তত্ত্ব বেরিয়ে আসে: সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য, পৃথিবী নয়; আর সূর্যের টানেই ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রহগুলো, সেইজন্যেই চন্দ্রসূর্যর উদয়-অস্ত হয়, দিনরাত্রি হয়। অথচ সেটা কোনো ভারতীয় বিজ্ঞানী-দার্শনিক প্রমাণ করার চেষ্টাই করলেন না। তিনি বললেন, ঠিক ওইখানেই ইউরোপের জিত। ‘আধুনিক ইউরোপে কিন্তু কোপার্নিকাসের তত্ত্বের ঘোষণা ভবিষ্যতে কেপলারের সূত্রাবলীর এবং সার্বজনীন অভিকর্ষ-তত্ত্বের মহতী আবিষ্কারকে সুনিশ্চিত করে তোলে।’ বাস্তবিকই তাই। যুগ যুগ ধরে চলে-আসা ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) বলেছিলেন, অ্যারিস্টটল আর চার্চ যাই বলুন, পৃথিবী নয়, সূর্যই আছে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে। কিন্তু কোপার্নিকাস নিজেও একটা গোল বাধিয়েছিলেন। তিনিও একটা অপরিষ্কৃত বিশ্বাসের গাড্ডায় পড়েছিলেন। পুরোনো দার্শনিকদের মতো তিনিও বৃত্তের গড়নকে আদর্শ বলে ধরে নিয়েছিলেন। যা গোল, তা অনিন্দ্য, এর কোনো হেরফের নাকি হতেই পারে না! হয়তো এর মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক

তাৎপর্যও দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। ফলে তাঁর মাথাতেই আসেনি যে, মহাকাশে ভ্রমণরত গ্রহরা বৃত্ত ছাড়া অন্য কোনো পথেও সূর্যপরিক্রমা করতে পারে।

কোপার্নিকাসের সেই ক্রটি শুধরে দেবার জন্য এগিয়ে এলেন জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০)। ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১)-র উরানিবর্গ মানমন্দিরে বছরের পর বছর, রাতের পর রাত আকাশ পর্যবেক্ষণ করে সম্পূর্ণ নতুন এক সিদ্ধান্তে এলেন তিনি। শাস্ত্র কী বলছে, না-বলছে, তার পরোয়া না-করে নিজের পর্যবেক্ষণ আর যুক্তির ওপর ভরসা রাখলেন। অকাট্য প্রমাণ পেলেন যে, পুরোনো দার্শনিকেরা যতই কেন বৃত্তের নিটোল গড়নের প্রেমে পড়ুন, আসলে কিন্তু গ্রহরা রসগোল্লার নয়, ডিমের ভক্ত। রসগোল্লার মতো গোল পথে নয়, ডিমের মতো উপবৃত্তাকার পথে তারা সূর্যকে ঘিরে পাক খায়। মহাকাশের মাঠে ফুটবল নয়, রাগবি খেলে বেড়ায় তারা। সূর্য থেকে তাদের একেকজনের দূরত্ব একেকরকম, একেকজনের ওজন একেকরকম। সূর্যকে ডিম্বাকার পথে পুরো পাক খেয়ে আসতে কোন গ্রহ কতটা সময় নেবে (যেমন পৃথিবী নেয় ৩৬৫ দিন), তার ফরমুলাটাও বলে দিলেন তিনি।

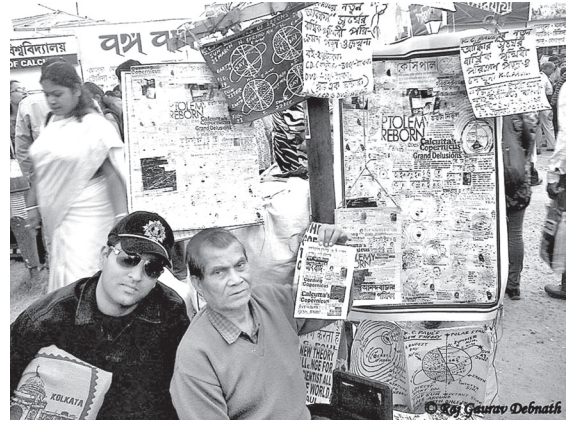
কেপলারের বাড়িয়ে দেওয়া পাস ‘রিসিভ’ করে এবার একেবারে গোলের মুখে চলে এলেন ইংল্যান্ডের আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৬)। এতদিনের এতজনের এতসব অঙ্ক আর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নিজস্ব কায়দায় অঙ্ক মিশিয়ে, গ্রহতারকা আর জোয়ারভাটার পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে, তিনি দেখালেন, ছোটোবড়ো আকারের গ্রহগুলো যে-যার মতো ডিম্বাকার পথ ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, কিন্তু একে অপরের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করছে না। এর মূলে আছে একটা টান— তিনি যার নাম দিলেন অভিকর্ষ। প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটাকে টানছে নিজ নিজ ভার অনুযায়ী। সেই

টানের জোরটাকে তিনি বলেন অভিকর্ষ বল। পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (বাংলাটা অক্ষয়কুমার দত্তের)।

সেটাকে মাপবার ফরমুলাও বলে দিলেন তিনি। এটাই বস্কিমের ভাষায় ‘সার্বজনীন অভিকর্ষ-তত্ত্বের মহতী আবিষ্কার।’ বস্কিমের আক্ষেপ, এ আবিষ্কার ভারতেই হতে পারত, যদি ভারতের বিজ্ঞানী-দার্শনিকেরা বিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন থাকতেন। তার বদলে কী ঘটল? ‘ভারতবর্ষে আর্ঘভটের (৪৭৬-৫৫০) অতি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা থেকে ভবিষ্যতে নূতন কোনো বিকাশ যাতে না ঘটে সেটাই সুনিশ্চিত করে তোলা হল।’ বড়ো মারাত্মক অভিযোগ। একজন বিজ্ঞানীর জ্বালানো প্রদীপ থেকে অন্য বিজ্ঞানীর প্রদীপ জ্বালানোর পথ ভারতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর্ঘভটের তত্ত্বকে যুক্তি-তর্ক-পর্ববেষ্ণনের আলায়ে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে, পরবর্তী ভারতীয় বিজ্ঞানী-দার্শনিকেরা সে-তত্ত্ব চর্চার পথ বন্ধ করে দিলেন।

বস্কিমচন্দ্র যে-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি, কার্তিকচন্দ্র পাল সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। গেছেন শুধু নয়, গত অন্তত চল্লিশ বছর ধরে তাঁর সেই মহতী আবিষ্কারের কথা অশোকের শিলালিপির মতো দেয়ালে দেয়ালে লিখে শহরের দৃশ্যদূষণ ঘটিয়েছেন। তিনি জানতে পেরে গেছেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভুল, আর্ঘভট ভুল, কোপারনিকাস ভুল, গ্যালিলিও ভুল, নিউটন ভুল, ঠিক শুধু কে সি পাল। সত্য এই যে, সূর্যই নাকি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে। না, এ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দরকার হয়নি কোনো মানমন্দিরের, কেননা বিশ্বাসে মিলিয়ে বস্তু। বস্কিম বেঁচে থাকলে অনুজ এক কবির লেখা উদ্ধৃত করে বলতেন, ‘এতদিনে জানলেম, যে-কাঁদন কাঁদলেম, সে কাহার জন্য।’

কে সি পাল কয়েক দশক ধরে আমাদের প্রচুর আনন্দ বিলিয়েছেন। আমরা বরাবরই তাঁর ঘোষণাকে রসিকতা বলেই জেনে এসেছি। বইমেলার দেয়ালে তাঁর আত্মঘোষণার পাশেই শোভা পেত: বাঙালি জাগো। কে যেন দুষ্টিমি করে টিপ্পনী কেটেছিল: কাঁচা ঘুম ভাঙাইও না। এইসব রসিকতা দেখে টের পাওয়া যেত, এত ভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গদেশ রঙ্গ হারায়নি। কিন্তু এখন আর সেকথা বলা যাবে না। কে সি পালের জীবনব্যাপী গো-এষণাকে ‘সন্মান’ জানিয়ে তথ্যচিত্র বানিয়েছেন অরিজিৎ বিশ্বাস। ছবির নাম ‘সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।’ এবং ২০১৮ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক



বইমেলায় সেই বিখ্যাত কে সি পাল

ফিল্মোৎসবে সে-ছবি পুরস্কৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য এই সময়, ১১ নভেম্বর, ২০১৮)! আর কী চাই। বাঙালি বুঝিয়ে দিয়েছে, দেবদূতেরাও যেখানে পা ফেলতে ভয় পায়, বাঙালি সেখানে অকুতোভয়ে দাপিয়ে বেড়ায়। নিজের মূর্ত্যতাই তার সম্বল, তাই সেটাকেই বিজ্ঞাপিত করে যদি পাদপ্রদীপের সামনে আসা যায়, মন্দ কী! বাঙালির বুদ্ধি যে খুব, সে-‘স্যাট্রিফিকেট’ তো অমিতাভ বচ্চন দিয়েই দিয়েছেন। ‘সন্মানিত’ দিদি বলেছেন, বচ্চন না এলে কলকাতা ফিল্মোৎসব অন্ধকার হয়ে থাকবে। তাছাড়া এখনকার হাওয়া তো গণেশ-মুণ্ড আর গান্ধারীর স্টেম সেল গবেষণার দিক থেকেই বইছে। সুতরাং বিজ্ঞানের ইতিহাস-টিতিহাস নিয়ে, যুক্তিচুক্তি নিয়ে খামোখা মাথা ঘামায় শুধু মুর্খেরা।

জয় হোক বাঙালির। এবার তার কাঁচা ঘুম সত্যিই ভেঙেছে। এই জাগরণ কি জাতি হিসেবে তার চিরনিদ্রার পূর্বাভাস? তবে ঝামেলা পাকান গ্যালিলিও-ট্যালিলিওর মতো ত্যাঁদড় জেদি লোকেরা, যাঁরা কিছুতেই কাণ্ডজ্ঞানের আওতা থেকে বেরোতে চান না। পোপ সাহেব যখন ভয় দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে তিনি ভুল করেছেন, তখন চুপিচুপি, স্ফাতোক্তির মতো তিনি নাকি বলেছিলেন, ‘যাই বলো, পৃথিবী তবু ঘুরছেই।’ শ চারেক বছর পরে, ভ্যাটিকানের আরেক পোপ ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন, গ্যালিলিওকে সাজা দেওয়াটা চার্চের খুব ভুল হয়েছিল।

হয়তো শ পাঁচেক বছর পর কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসবের কর্তারা বলবেন, অরিজিৎ বিশ্বাসের ছবিকে পুরস্কার দেওয়া তাঁদের ভুল হয়েছিল!

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

প্রত্যেকটি বন্যাই কিছুটা মনুষ্যকৃত

তপোব্রত সান্যাল

বন্যার পৌনঃপুনিকতা প্রতিরোধ করা আদৌ সম্ভব কিনা, আলোচনাটা মূলত তাই নিয়েই। প্রশ্ন উঠবে— কখন বন্যা হয়? বন্যা হয় তখনই, যখন নদীর দু-কূল প্লাবিত হয়ে যায় এবং তার জলস্তর এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছয়, তার যে জলধারণ ক্ষমতা, সেটা আর থাকে না। অতিরিক্ত বর্ষণ এর অন্যতম প্রধান কারণ। একটা বিতর্ক সবসময়ই হয়— বন্যা কি প্রকৃতিসৃষ্ট, না মনুষ্যকৃত? বন্যার উৎসটা কিন্তু প্রকৃতি, তা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিভিন্ন প্রকৌশলের মাধ্যমে বন্যাকে আটকাবার চেষ্টা করেছে। আমি যখন নেদারল্যান্ডে ছিলাম সেখানে দেখেছি বছর বছর বন্যায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে যেত। সেখানকার মানুষ মাটি দিয়ে, গাছ কেটে, গাছের ডাল ভেঙে, পাতা দিয়ে কোনও রকমে বন্যাকে ঠেকাবার চেষ্টা করত। বন্যা আটকাবার এটাই ছিল কৌশল। তারপর আস্তে আস্তে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে নানারকম উদ্ভাবনার মাধ্যমে বন্যাকে ঠেকাবার নানারকম কৌশল বার করেছিল। তা সত্ত্বেও বন্যাকে কিন্তু প্রতিরোধ করা যায় নি। সেটা কেন? নদী তার জলধারণ ক্ষমতা হারাল কেন? নদীর যে জলধারণ ক্ষমতা, সেটা কেন অতিরিক্ত জল বহন করতে পারছে না? কারণ প্রতিটি নদী আদতে জলনির্গম প্রণালী। অতিবৃষ্টি ও অববাহিকায় যেখানে যেখানে সমুদ্র সমীপ অঞ্চলে ঝড়ের জন্য সাগরের জল ফুঁসে উঠে সব ভাসিয়ে দেয় আর বন্যারোধক যে সব স্বরঞ্জ বাঁধ (ব্যারাজ) সেগুলো যখন কাজ করে না, তখন হতে পারে। প্রশ্ন উঠবে, নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমে কেন? নদীর গর্ভতল উঁচু হয়, তার মূল কারণ সেখানে পলি জমে। পলি সঞ্চয় নিরবচ্ছিন্নভাবে হতে থাকলে নদীগর্ভ উঁচু হতে থাকে। এছাড়া আছে কূলভাঙা বা তীরভাঙা, যাকে বলি ভাঙন। এই করেই নদীর তার জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। নদীর স্বাভাবিক গতিকেও আমরা বাধা দিচ্ছি। নদীর এই পলিসঞ্চয়কে



ঠেকানো যাবে না। পশ্চিমবঙ্গ মাটির দেশ। সেখানে অজস্র নদী এবং কোনো নদীর পাড়ই সুরক্ষিত নয়। যাঁরা বিদেশে গিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন, সেখানে সব নদীর পাড়ই সুরক্ষিত। সেখানে ভাঙন কম। অবশ্য সে দেশ অনেক ছোট, আমাদের তুলনায় কিছুই নয়। লার্জ স্কেল ডিফারেন্সেশন, মানে ব্যাপক হারে বনকে কেটে ফেলা হচ্ছে। সাধারণভাবে বৃষ্টি যখন পড়ে, তার জল গাছের পাতায় বা ডালে আটকে থাকে, তার দরুন বৃষ্টির জল সরাসরি মাটিতে পড়তে পারে না। সেই কারণেই মাটি জল শোষণ করার অবকাশ পায়। বন কেটে ফেলার ফলে বৃষ্টি যখন হয়, তার জল সরাসরি মাটির ওপর পড়ে। তার মধ্যে যে গতি ও শক্তি আছে, সেটা মাটিকে বিল্লিষ্ট করে দেয়। নদীর জলধারা যখন বহমান, সেটা নদীর অভিমুখী, তখন সেসব বিল্লিষ্ট মাটির কণাগুলিকে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। এছাড়া আছে হিলিং ডিসচার্জ— যেমন অজয় নদ। অজয়ের জল হঠাৎ ফুঁসে উঠল তার অববাহিকায়। বৃষ্টির ফলে সেটা এসে পড়ল কাটোয়ার কাছে হুগলী নদীতে। হুগলী নদীর ধারণক্ষমতা অনেক বেশি নয়, ফলে সেখানে বন্যা হল। অতীতে জলস্বীতির ফলে এরকম বেশ কয়েকবার হয়েছে। যেখানে নদীর জল গিয়ে পড়ছে সেগুলো শাখানদী। শাখানদীগুলোর জলধারণ করার ক্ষমতা নেই। শাখানদী জলটা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই জল যখন মূল নদীতে গিয়ে পড়ছে তখন সেখানকার ধারণক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে, ফলে কূল ভেঙে সন্নিহিত সমস্ত অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা ব্যাপার নদীর গতিপথের পরিবর্তন। নদীর গতিপথের এত পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের মতো আর কোথাও হয়েছে কিনা জানা নেই। তার কারণ সমস্ত গাঙ্গেয় অঞ্চল গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের পলি জমে হয়েছে। মেরিন ফসিল অর্থাৎ সমুদ্রের যে জীবাশ্ম সেটা পাওয়া গিয়েছে খাসিয়া পাহাড় পর্যন্ত, তার মানে সমুদ্র ঐ পর্যন্ত ছিল একসময়। অর্থাৎ পলি ক্রমশ সরে সরে এসে জমে জমে বঙ্গভূমি তৈরি

হয়েছে। নদী চায় সবচেয়ে কম বাধার পথ ধরে চলতে এবং তার একটা ঢাল থাকা দরকার, যে ঢাল বেয়ে সে তার গতির সঙ্গে জলের পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে। সেইজন্যই সে বারবার এদিক-ওদিক করে। হুগলী-ভাগীরথীর পশ্চিমাংশ অনেক বেশি সংগঠিত, তাই ভাঙন ঐদিকে হয় না। যেটা প্রকৃত রাত্ অঞ্চল, সেখানে কিন্তু ভাঙনের কথা বেশি শোনা যায় না। সব হচ্ছে পূর্বদিকে। এদিকে নদী অনেকবার তার গতি পাল্টেছে, গতি হারিয়েছে। এর ফলে ভাঙন ও মৃৎক্ষয় হচ্ছে। এগুলো জলধারণ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় এবং নদীর গর্ভতলকে উঁচু করে। সেটা প্রকৃতির ব্যাপার, মানুষের কিছু করার নেই। কিন্তু বারবার নদীর পাড় যদি বানাতে হয় তাহলে কত কোটি কোটি টাকা ব্যয় হবে, তার পরিমাপ করা যাবে না। যেখানে জোয়ার-ভাটা খেলে, সেখানে একটা অবরোধ তৈরি হয়। যখন জোয়ার হয়, তখন মাঠঘাট ভেসে যায়। এরকম প্রায়ই হয়। জল নদীতে যেতে পারে না, উল্টোদিকে চলে যায়। তাই জোয়ারের জলের সঙ্গে বৃষ্টিজনিত জলধারা যদি যেতে চায়, সেখানে সে বাধা পায়। কেবলে এবারে হয়তো এটাই হয়ে থাকবে। আরেকটা ব্যাপার হল অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন, জ্বরদখল। মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন যে, রেলওয়ে এমব্যাঙ্কমেন্ট যেভাবে করা হয়েছে, তার তলা দিয়ে যে প্যাসেজ আছে, সেটা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সেটা জলের অপসারণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে বাঁধ থেকে জলছাড়া। হঠাৎ দেখা গেল, ডিভিসি থেকে জল ছাড়া আরম্ভ হয়ে গেল, ময়ূরাক্ষী দিয়ে জল আসতে লাগল। নদীতে সে জলধারণ করার ক্ষমতাই নেই। কিন্তু বাঁধকে সুরক্ষার জন্য জল ছাড়তে বাধ্য হতে হচ্ছে, এগুলো অনেকটাই মনুষ্যকৃত বলা যায়। কারণ আগে থাকতে আমরা যদি প্রস্তুতি নিতে পারতাম, তাহলে কিন্তু এভাবে জল ছাড়ার প্রয়োজন হত না। বন্যা কতটা তীব্র, সেটা নির্ভর করে জলের স্তর কতটা উঁচুতে এবং কতক্ষণ ধরে তার স্থায়িত্বকাল— এ দুটোর ওপর নির্ভর করে বন্যার প্রাবল্য। নদী যত উঁচু হবে বন্যার প্রাবল্য তত বেশি হবে, ক্ষতিও বেশি হবে। সরকার হিসেব যেটা করে সেটা হল, কত লোক গৃহহীন হল, কত লোকের প্রাণহানি ঘটল, কত সম্পত্তি নষ্ট হল, এইসব হিসেব করে বন্যার প্রাবল্য নির্ধারণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি বন্যাই কিছুটা মনুষ্যকৃত, কিছুটা প্রকৃতিজাত। কিন্তু কোনটা বেশি প্রবল, সেটার কোনো সাধারণীকরণ হয় না। সেটা মানুষই করেছে। প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এভাবে কোনো চটজলদি সিদ্ধান্তে আসাটা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু বন্যার পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য যদি প্রাক্-প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তাহলে বন্যার যে ক্ষতিকর দিকটা, সেটা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

কেরালায় সম্প্রতি যে বন্যা হয়েছিল সে কথায় আসছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে ১ জুন ও ৯ আগস্টের মধ্যে সাধারণ যে হারে বৃষ্টিপাত হয়, তার থেকে ৪২ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। ৯ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে ২৫৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছিল এবং ১৭ আগস্ট ৪২৪ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এর কারণ অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন, পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য কোনোরকম বাছবিচার না করে, নদীর একেবারে ধার পর্যন্ত বাঁধ দেওয়া। বৃষ্টির প্রাক্-পূর্বাভাস, সেটাতেও নজর দেওয়া হয় নি। বাঁধ কীভাবে রাখতে হবে, পাড়ের কীভাবে সংরক্ষণ করা উচিত, সেগুলো পালিত হয় নি। সেখানে ৪৪টা বাঁধ থেকে একসঙ্গে জল ছাড়া হয়েছিল। তার ওপর তামিলনাড়ুর একটা বাঁধ থেকেও জল ছাড়া হয়েছিল। এসব মিলিয়ে কেরালার বন্যা এত প্রবল ও ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে বন্যা হয়েছিল সেটা সরকারি মতে মেঘভাঙা বৃষ্টি। ময়ূরাক্ষী, দামোদর, বরাকর, অজয়, ভাগীরথী সেখানে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছিল। ১০০০-১৪৮০ মিলি পর্যন্ত বৃষ্টি তিন থেকে চারদিনের মধ্যে হয়। যে সমস্ত ব্যারেজ ছিল, তাতে ছিল ৩.৮০ কিউসেক পরিমাণ জল। বীরভূমের মতো খরাপ্রবণ অঞ্চলে গত ১৫০ বছরে এত প্রবল বৃষ্টি আর কখনো হয় নি। কিন্তু ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ এই তথ্য মানতে রাজি হয় নি। সেটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। ভূত্বীয় কারণে পশ্চিমবঙ্গে নদীর তীরভূমির ক্ষয় একটা প্রধান কারণ। ভূত্বীয় ভঙ্গুরতা, ভূকম্পনজনিত বিপর্যয়, চাষ করার যে প্রথা সেটার পরিবর্তন। এর ফলে সমস্ত পলি নদীগর্ভে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে নদীর ধারণক্ষমতা কমে গিয়েছিল। একটা জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল, হাইকোর্ট একটা কমিটি তৈরি করেছিল। রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেটাকে টেলে সাজার কথা বলা হয়েছিল, সেখানে যতটুকু কাজ করার কথা ততটুকু কাজও হয় নি। সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সংস্থাকে এক ছাতার তলায় আনতে হবে। উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে নদীর যে গতিপ্রকৃতি সেটাকে অনুধাবন করে বন্যাসংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সঙ্গে সঙ্গে জানার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সংহত প্রচেষ্টা না হলে বন্যার এই তীব্রতাকে প্রশমিত করা যাবে না। যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এর মধ্যে দীর্ঘসূত্রতার কোনও অবকাশ নেই। এবং যেগুলো হাতে নেওয়ার কথা সেগুলো যাতে হাতে নেওয়া হয় সেটা দেখতে হবে। সেটা অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যের ব্যাপার, তার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। বন্যার তীব্রতা প্রশমনের একটা পদ্ধতি হচ্ছে, বন্যার জলের যে গতি তাকে কমিয়ে দেওয়া, সেইসঙ্গে যাতে ভূমিক্ষয় না হয় সেটা দেখা। এর জন্য নদীতে ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল এবং যাতে করে সেচের সুবিধা হয় নদীতে মাটির যে

আর্দ্রতা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে যেন থাকে। যে সমস্ত বাঁধের জলাধার আছে তার ধারণক্ষমতা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে, তার ফলে বাঁধের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা যাচ্ছে। ফলে জল ছাড়তে হচ্ছে, এগুলো থেকে পলি তোলা হয় না। এছাড়া দেখতে হবে রেলওয়ে এবং রাস্তার যে এমব্যাঙ্কমেন্ট আছে তার তলায় যে কালভার্ট আছে সেগুলো যথাযথ এবং পর্যাপ্ত কিনা। কেন্দ্রীয় সরকারের WISDOM নামে একটি সংস্থা আছে। সেই ওয়েবসাইট www.indiawater.com-এর সদ্যবহার করতে হবে। আমাদের একটা আত্মতৃপ্ত ভাব আছে— বন্যা আসে আসুক। কিছু ত্রাণ, ত্রিপল পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে! এটা বন্যা নিরোধের প্রস্তুতি নয়। এর জন্য একটা দীর্ঘস্থায়ী পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে। নদীর স্বাস্থ্যকে ফেরাতে হবে। আমরা, যারা নদীর কাছাকাছি থাকতে চাই, নদীর জল ব্যবহার করতে চাই, দেখা গেছে তারা ই বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে, ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বন্যার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি হয়েছে পাঞ্জাবে, তারপরই পশ্চিমবঙ্গে। কেরালার স্থান হচ্ছে সপ্তম স্থানে। বন্যার জলের পরিমাণ কত, তা হালের তথ্য থেকে জানা দরকার। ভবিষ্যতে যদি কোনো পরিকল্পনা করতে হয় তাহলে প্রত্যেক বছর তা আপডেট করতে হবে।

বাংলায় অসংখ্য নদী। তাদের জলধারণ ক্ষমতা এক নয়। কোনোটা হিমালয় থেকে উদ্ভূত, কোনোটা সন্নিক্ত কোনো মালভূমি থেকে এসেছে। কোনো কোনো নদী স্থায়ী, যাতে সারা বছর জল থাকে, কোনোটা বর্ষাকালে সজীব হয়। আমাদের এখানকার প্রধান জলনির্গম প্রণালী হচ্ছে হুগলি-ভাগীরথী। এছাড়া বাংলাদেশে কিছু নদী আছে। কিছু নদী এখান থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে পড়েছে অথবা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছে। শুধু যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হয়ে সেখানেই পড়েছে তা নয়। সুতরাং এই নদীগুলোর বিশ্লেষণ করতে হলে শুধু আমাদের নিজেদের তথ্য নয়, বাংলাদেশের তথ্যের সঙ্গেও আদানপ্রদান হওয়া দরকার। সমস্ত বঙ্গভূমির নদীপথ এখনও নির্ধারিত হয় নি, তারা কেবলই এঁকেবেঁকে চলতে চায় সবচেয়ে অনুকূল ঢাল খোঁজার তাগিদে এবং যেখানে সে সবচেয়ে কম বাধা পায় সেখান দিয়ে সে চলে। নদীকে আমরা যদি নির্জীব মনে করি তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব। নদী সজীব, প্রাণময় এই ভাবনাটা যদি মানুষের মধ্যে না ঢোকানো যায় তাহলে কিন্তু কিছুই করা যাবে না। কোনও কিছুই অকারণে হচ্ছে না। প্রত্যেকটার পেছনে একটা কারণ আছে। সেই কারণগুলো আগে খুঁজে বের করা দরকার। নানারকম বাধা আছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা খুব জটিল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সব সময় সমান নয়। গড়পরতা আন্দাজের ওপর নিখুঁত পূর্বাভাস দেওয়া একেবারে অসম্ভব। নদীর ভূ-সংস্থানের

যে পরিবর্তন, বাষ্পীভূত হচ্ছে কীভাবে, মাটির পরিবাহিতা, নদী কতটা জল শুষতে পারে, এসব জানা দরকার। এসব তথ্য না জানলে সঠিক বিশ্লেষণ করা যায় না। ভারতের রিভার বেসিনের সীমা হচ্ছে ৮,৬১,৪০৪ বর্গ কিলোমিটার। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অংশ হচ্ছে ৮.৩ শতাংশ, ব্রহ্মপুত্রের ৭০ হাজার ৯০০ বর্গ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলো হচ্ছে উত্তরদিকে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, মহানন্দা— এরা পাহাড় থেকে এসে পুরোপুরি ব্রহ্মপুত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। পশ্চিমদিকের নদীগুলো ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী— এগুলো হয় সরাসরি গঙ্গায় ভাগীরথীতে পড়ছে অথবা অন্য নদীর মাধ্যমে পড়ছে। মধ্য পশ্চিমবঙ্গে জলঙ্গী এবং চূর্ণী। একেবারে দক্ষিণে সুন্দরবন। সেখানে ইছামতী, রায়মঙ্গল, মাতলা, বিদ্যাধরী। সুন্দরবনে অসংখ্য খাল ও নদী আছে। এবার ডিভিসি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ডিভিসি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি আমেরিকার টেনেসি ভ্যালির অনুকরণে দামোদর ভ্যালির নামকরণ করেছিলেন। বলেছিলেন, বাঁধ তৈরি করতে হবে। কোন জায়গায় করতে হবে, তার জায়গা ঠিকমতো নির্বাচন করতে হবে। বনসৃজন করতে হবে, যাতে করে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। জলাধারে যে পলি জমতে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক করেছিলেন। মেঘনাদ সাহা এবং তাঁর বন্ধু কমলেশ্বর রায় একযোগে নদীর ওপর ১১টা পেপার লিখেছিলেন। দামোদর ভ্যালি প্রজেক্ট তৈরি করেছিলেন তুরডুইন নামে একজন প্রযুক্তিবিদ। দুটো পর্যায়ে এটা করার কথা ছিল। প্রথম পর্যায়ে চারটে বাঁধ হবে মাইথন, পাঞ্চত প্রভৃতিকে নিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে তিনটি। বলা হয়েছিল, তার ধারণক্ষমতা হবে ২৯ লক্ষ ৯১ একর ফুট। চারটে ড্যাম যখন করা হল, প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল, সেখানে জলধারণ ক্ষমতা ছিল ১৫.১ লক্ষ একর ফুট। কিন্তু আসলে দেখা গেল, এই ক্ষমতাটা কমে দাঁড়াল ১৪.১ লক্ষ একর ফুটে। এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ৬.৬ লক্ষ একর ফুট। কোথা থেকে কোথায়! দুর্গাপুরেও ব্যারেজ আছে। তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, পরে যে তিনটি ড্যাম করার কথা বলা হয়েছে, সেটা করলে কি কার্যকর হবে? জলধারণ ক্ষমতা যেখানে এতটা কমে গিয়েছে, সেখানে তিনটে বাঁধে কুলোবে কিছু? এ প্রশ্নটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিবিদদের এটা দেখা উচিত। নদীর গতিপথ, আচরণ এবং অববাহিকার চরিত্র এত বছর পরে অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এখন একটা প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে, বড় বাঁধ না ছোট বাঁধ – কোনটা করা উচিত? বড় বাঁধ হল যাতে করে অন্তত ১৯ লক্ষ কিউবিক মিটার জল ধরে। কিন্তু ছোট বাঁধ হলে বেশি জল ধরতে পারে না। বন্যা প্রশমনের যে ব্যবস্থার কথা ভাবা হয় সেটাকে করা সম্ভব নয়। পরিবেশবিদরা বলছেন এতে করে সমস্ত অববাহিকার চরিত্র বদলে দেওয়া হয়েছে। আমরা

পরিবেশের ক্ষতি করছি, নদীর স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে এই ধরনের বিশাল বাঁধ করার কোনও যুক্তি নেই। কত কম বাধায় নদীর থেকে আমরা বেশি সুবিধা পেতে পারি সেটাই ভাবা উচিত। মোদ্দা কথা, বড় বাঁধ তৈরি করার আগে সমস্ত রকম বিকল্প আমাদের দেখা উচিত সত্যিই বড় বাঁধ অপরিহার্য কি না। ফরাঙ্কা ব্যারেজ নিয়ে অনেকের কৌতূহল আছে। ফরাঙ্কাতে ব্যারেজ করা হল। একটা ফিডার ক্যানেল দিয়ে অবরুদ্ধ জলকে নিয়ে ভাগীরথীতে ফেলা হল। এই নিয়ে বাংলাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিবাদ জলবণ্টন নিয়ে। বাংলাদেশ চায় তার কৃষির জন্য জল আর ভারত চায় তার জল হুগলী নদীকে সঞ্জীবিত করার জন্য। আদতে ফরাঙ্কা ব্যারেজ নাম ছিল না। আগে নাম ছিল Improvement for the Port of Calcutta. কলকাতায় জাহাজ চলতে গেলে হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়ানো দরকার কিন্তু অতিরিক্ত জল যদি না নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তা হবে না। উইলকসন বলেছিলেন, এখানে চূর্ণা বা জলঙ্গীতে বাঁধ দেওয়া হোক, সেই জলটা নিয়ে এসে ভাগীরথীতে পড়ুক। কিন্তু সেটা হয় নি। ফরাঙ্কার যে আদৌ উন্নতি হয় নি সেটা জোর করে বলা উচিত নয়। গঙ্গা বিভাজিত হয়ে ক্রমশ সরে এসেছে, সেটা এক জায়গায় স্থির থাকেনি। ভাটার সময় জাহাজ হুগলী নদীতে যেতে পারে না, জোয়ারের জল বাড়লে তখন জাহাজ যেতে পারে। নিরবচ্ছিন্নভাবে ৪০,০০০ কিউসেক জল দরকার প্রতিদিন, এর কোনও বিকল্প নেই। এটা করেছিলেন দুজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ। যদি ৪০,০০০ হাজার কিউসেক জল রোজ পাওয়া যায় তাহলে ১৯৩৬ সালে গঙ্গার যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে। এখন হচ্ছে ১০ দিনের চক্র (সাইকেল)। বাংলাদেশ ১০ দিন জল বেশি পাবে, ১০ দিন কম পাবে। নদীর জলের পরিমাণ যদি ক্রমাগত এভাবে বদলায়, তাহলে নদীর পলিসংবহনের চরিত্রটাই পাল্টে যায় এবং তার ফলে নদীর আচরণের নানারকম পরিবর্তন হয়। কত পলি আসে? ১৫০ লক্ষ টন পলি প্রতি বছর হুগলি দিয়ে আসে। জোয়ারের সময় পলিগুলো ওপরের দিকে উঠে আসে ভাটার সময় নেমে যায়। যখন নদী স্রোতহীন থাকে তখন ঐ পলিগুলো নদীগর্ভে পড়ে।

বাঁধ দিলেই বন্যা কি ঠেকানো যাবে? এটা কি অবিমিশ্র সুবিধে? যখন বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, তখন পলিবাহিত যে জল সেটা গিয়ে ধাক্কা মারছে বাঁধে, তাতে পলিগুলো বিযুক্ত হয়ে আবার নদীগর্ভেই পড়ছে। তাহলে বাঁধ দিয়ে বন্যা হয়ত ঠেকানো যায়, কিন্তু নদীর ধারণক্ষমতা অনেক কমে যায় পরোক্ষে। তার ফলে সুন্দরবনের ভূমির চরিত্রটাই পাল্টে গেছে। ম্যানগ্রোভ আছে বলেই সুন্দরবনের উপকূলের যে পরিবেশ তা পাল্টায় নি। উত্তরবঙ্গে তিস্তা নদী সবচেয়ে বেশি বন্যাপ্রবণ। ব্রহ্মপুত্রে বন্যার

कारणे क्षयक्षतिर प्रवणता गङ्गार चेये अनेक बेशि। तार कारण हच्चे, ब्रह्मपुत्रेर गड़ उच्चता ७७०० मिटार। ँ उच्चता थेके १५० मिटार नेमे याच्चे प्राय जलप्रपातेर अवस्था। सेथाने तार माटि क्षय करार क्षमताओ अनेक बेशि। एसब नये विभिन्न कमिटि हयेच्चे, प्रकल्प (स्किम) तैरि हयेच्चे। किन्तु तार रूपायण करते प्रचुर टाकार प्रयोजन। के देवे एत टाका? केन्द्रीय सरकार शुधु पश्चिमबङ्गेर जन्य एत टाका व्यय करवे ता प्रत्याशित नय। अथाधिकारेर डिन्त्रिते टाका चाओया उचित। विश्व उषणयन हले तुथारशैल (ग्लेसियार) गलवे, फले सामुद्रिक जलोच्छ्वास हवे, सेटोई स्वाभाविक। एर फले समुद्रेर मोहनार काछाकाछि येसब नदी, येथाने ज्योयार-भाँटा थेले सेसब नदी र्बेचे थाकवे। तौ हगली नदीर भविष्यं नये दुश्चिन्तार कोनो कारण आच्चे बले मने करि ना।

लवणान्त जलेर अनुप्रवेश नये आलोचना करा दरकार। स्वादु जल येटा उजान थेके आसे, तार परिमाण यदि बाड़ानो यय, ताहले लवणेर परिमाण कमे यावे। ताहले १०००-ए २० भाग वेडे यय एर फले एकटा density gradient तैरि हय, तार जन्य पलि बेशि जमार प्रवणता थाके। पलि जमाटौ तो समस्या। यखन टेउ आसे, तार एकटा उर्धुगामी चाप थाके। भाङन हले पाथर फेलार प्रवणता ये कतटा अबैज्जनिक, सेटौ बुक्ते हवे। यखन जलतल (ओयाटार लेभेल) ओपरेर दिके थाके, तखन किन्तु भाङन हय ना। पलि आटकावार फाँद करते हवे। नदीर मध्ये एकटा अषल, येथाने सब पलि जमा हय नियमित ताके पाल्टाते हवे याते माटि भेङ्गे नदीते ना पड़ते पारे। अनियन्त्रितभावे ड्रेजिङ करले काजेर काज हय ना। ड्रेजिङ करले नीचु हये यय सेथाने आवार पलि जमवे। बारवार ड्रेजिङ करले कोटि कोटि टाका व्यय हय।

अपरिकल्पितभावे सब किछु हच्चे। नदीर स्वभाव ओ तार मर्जि बुक्ते चलते हवे। जि एल मरिस बलेछेन, ये समस्त बाँधेर जलाधार एक-पषमांश जलाधारेर क्षमता अर्धेक हये यय। पाष्वेत जलाधारेर क्षमता अर्धेक हये यावे २०२१, माईथने क्षमता अर्धेक हवे २०५४ साले। पश्चिमबङ्गे अजस्र जलाशय। पुकुर आच्चे २९७ हज्जार।

नदी गवेषणा केन्द्र यदि सक्रिय ना हय, नदीसंक्रान्त तथ्य यदि सठिकभावे ना थाके ताहले किछुई करा यावे ना। ताहले भविष्यं कि पश्चिमबङ्गेर? भागीरथीर स्वास्थ्य आगे देखा दरकार। मनोविदरा येमन मानुषेर मनेर अक्षिसन्धि खुँजे देथार चेष्टा करेन नदीविशेषज्जेदरेओ नदीर अक्षिसन्धिगुलो बुक्वार चेष्टा करते हवे। ऋपावण बाँध तैरि करले बन्या ठेकानो संभव नय। सुतरां एकटा संहत, सुपरिकल्पित प्रचेष्टा ना निले बन्याके तो एडाओ यावेई ना, नदीर स्वास्थ्य ओ विपन्न हवे।

उमा

স্মারক বক্তৃতার কিছু মুহূর্ত



- ১) 'বাঁধ বন্যা বিপর্যয়' সঙ্কলনটির উদ্বোধন করছেন তপোব্রত সান্যাল। পাশে চিত্ত সামন্ত।
- ২) উদ্বোধনী সঙ্গীতের গায়িকা কাবেরী রায়
- ৩) স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন তপোব্রত সান্যাল
- ৪) প্রেক্ষাগৃহের বাইরে চলছে বইয়ের বিকিকিনি
- ৫) বাইরে চা খেতে খেতে আড্ডা



যুক্তি তক্কো ট্র্যাডিশন

চিত্ত সামন্ত

সেদিন সকালবেলায় একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পেয়ে চমকে উঠলাম! যে পাঠিয়েছে, কেউ আবার তাকে পাঠিয়েছে। তাই উৎস ধরা গেল না। ঘটনাটা সত্যি কিনা জানতে গুগল জ্যাঠার শরণাপন্ন হতে হল। তাতে দুটো বিচিত্র ধর্মীয় প্রথার হদিশ পেলাম। পাঠকের সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে এই লেখা।

এঁটো পাতায় গড়াগড়ি

এটা সবার জানা যে, দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের ছড়াছড়ি। কেবল সংখ্যায় নয়, প্রাচুর্যের দিক থেকেও দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো মন্দির দেশের যে কোনো মন্দিরকে টেক্কা দেবে। কর্ণাটকের উদিপিতে তেমনই অখ্যাত মন্দিরের নাম ‘কুঙ্কে সুব্রহ্মণ্যম’। এখানে প্রতি বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে ‘চম্পা যষ্টি’ উৎসব হয়। সেই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ‘মাদে স্নান’। মূলত হিন্দুদের মধ্যেই সীমিত এই উৎসব। দুপুরে ভক্তদের ভোগ-প্রসাদ, দক্ষিণ ভারতীয় মেনু কলাপাতায় পরিবেশন করা হয়। সেখানে সাধুসন্ত ও ব্রাহ্মণেরা আগে খান, তারপর বাকিরা। সাধুসন্তদের খাওয়া হয়ে গেলে ফেলে-যাওয়া এঁটো পাতার ওপর নিচুজাতের ভক্তেরা গড়াগড়ি দেন। তারপর মন্দিরের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া কুমারধারা নদীতে স্নান করেন। এই হল গিয়ে ‘মাদে স্নান’। এই (কু)প্রথা চলে আসছে ৫০০ বছর ধরে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এতে চর্মরোগ সারে, সন্তানলাভ হয়।

এছাড়াও নানান দৈব মাহাত্ম্যের গল্প শুনতে পাওয়া যায়। মাদে স্নান নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বহু মানুষ ও সংগঠন এই প্রথাকে কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করেন। কর্ণাটকের ‘অনুলত শ্রেণী সচেতনতা ফোরাম’ দাসপ্রথার সঙ্গে তুলনা টেনে মাদে স্নান নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে। তারা মনে করে, এই প্রথা নিম্নবর্গের মানুষের ওপর উচ্চবর্গের মানুষের এক ধরনের অত্যাচার। মজার কথা হল, সব বর্গের হিন্দুদের মাদে স্নানে অংশ নিতে দেখা যায়। রাজ্যের উচ্চ আদালত কর্ণাটকের ‘অনুলত শ্রেণী সচেতনতা ফোরাম’-এর করা মামলায় এই প্রথা টিকিয়ে রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য সেই রায়ের ওপর স্বর্গিতাদেশ দেয়। মামলাটি এখন আদালতের বিচারাধীন।

কর্ণাটকের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংগঠন আবার এই প্রথা চালু রাখার স্বপক্ষে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। ওদের যুক্তি, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ স্বেচ্ছায় মাদে স্নানে যোগ দেয়, যা তাদের ভাবাবেগ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং একে যুক্তি দিয়ে বিচার করা উচিত নয়।

মালেকুদিয়া আরেকটি উপজাতি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের ভক্তদের ওপর মন্দিরের রথ সাজানোর দায়িত্ব থাকে। তারাও চায় না যে এই প্রথা নিষিদ্ধ হোক। তারা হুমকি দিয়েছে, মন্দির কর্তৃপক্ষ যদি মাদে স্নান বন্ধ করতে উদ্যোগী হয় তো তারা সমস্ত রকম অসহযোগিতা করবে। রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্যের কথা ভেবে এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করার কথা ভেবেছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং



সরকার কেউই এই প্রথা চালু থাকুক তা চায় না। কিন্তু ভক্তদের চাপে স্থানীয় প্রশাসন নতিস্বীকার করে বসে আছে। একদিকে বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের যুক্তি ও দাবি এ প্রথা বন্ধ হোক। আবার অন্যদিকে রয়েছে ভক্তদের ধর্মীয় ভাবাবেগ এবং ৫০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্য। ‘সবার ওপরে ভোট সত্য’; শ্যাম রাধি, না কুল রাধি অবস্থা। এরই মধ্যে আদালতকে এড়িয়ে বিধানসভায় একটি কুসংস্কারবিরোধী বিল আনার চেষ্টা করেও সরকার ব্যর্থ হয়। তাই সবই যেমন ছিল তেমনি রইল! এতেও অবাক হবার কিছু নেই। এত কাণ্ডের পরেও রাজ্যের নানান প্রান্ত থেকে দলে দলে ভক্তেরা এই উৎসবে যোগ দিতে আসছে আর এঁটো কলাপাতায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।



রক্ত ঝরতেও দেখা যায়। পাশেই অ্যান্থ্রোলেন্স-সহ মেডিকেল ইউনিট হাজির থাকে। কিন্তু ভক্তেরা মাথা ফেটে রক্তারক্তি হলেও চিকিৎসা করাতে রাজি হন না। কাটা জায়গায় হলুদ আর বিড়ুতি লাগিয়ে দেন।

ভক্তের মাথায় নারকেল ভাঙা

‘পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা’ জনপ্রিয় প্রবাদ। সে না হয় বোঝা গেল। তাই বলে নারকেল! হ্যাঁ, নারকেল। শোনা যায়, সাহেবি আমলে তামিলনাড়ু (তখন মাদ্রাজ) জুড়ে রেললাইন পাতার কাজ চলছিল। গ্রামবাসীরা তাদের সুবিধের জন্য গতিপথ সামান্য বদলাবার অনুরোধ করেছিল।

সাহেবরা নাকি মজা করেই বলে, তা হতে পারে, তবে রাস্তায় পড়ে থাকা পাথর যা নারকেলের মতই দেখতে, তা মাথায় ঠুকে ফাটাতে হবে। সহজ সরল গ্রামবাসীদের কাছে সাহেবের বলা মানে নির্দেশ এবং সেইমতো কাজ। সেই শুরু। যা পুজোয় রূপান্তরিত হতে বেশি সময় লাগে নি। বিচিত্র ও মারাত্মক এই পুজো! কারুর, কোয়েম্বাটোর ও মাদুরাই জেলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ল এই প্রথা। কারুর শহরে মহাদানাপুরম গ্রামে মহালক্ষ্মীআম্মান মন্দিরে প্রতি বছর জুলাই-আগস্ট মাসে স্থানীয় ‘আদি’ উৎসবের সময় মাথায় নারকেল ফাটানো চালু হয়। দু দিন ধরে চলে এই উৎসব। হাজারখানেক ভক্তের সমাগম হয়। সকাল সকাল চানটান করে নিরামিষ খেয়ে ভক্তেরা মন্দিরচত্বরে অপেক্ষা করতে থাকেন। রোগমুক্তি, জীবনে সাফল্য, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি— ভক্তদের নানারকম চাহিদা। দৈবকৃপা পেয়ে (?) দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও আসেন অনেক ভক্ত। ছেলে-বুড়ো, এমনকি মহিলাদেরও দেখা যায়। পুজো সেরে পুরোহিত (এখানে সাধারণত অরাম্ভণ শ্রেণীর) লাইন করে মাথা নিচু করে বসে—থাকা ভক্তদের মাথায় নারকেল ফাটাতে থাকে। সবার মাথায় নারকেল ফাটানো হয়ে গেলে পুজোও শেষ হয়। অনেকে মাথায় নারকেলের ঘা খেয়েও সোজা হেঁটে চলে যান। ভাবখানা দেখান, যেন কিছুই হয়নি! কেউ আবার মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। কারো কারো মাথা ফেটে

এই প্রথা যে কতটা বিপজ্জনক তা বোঝে শুধু ডাক্তার আর মানবাধিকার কমিশন। এই কুপ্রথা বন্ধ করতে মানবাধিকার কমিশন অনেক চেষ্টা করেছে। হেঁচৈ করাই সার। সরকারের কানে জল ঢোকেনি। ভোট বড় বালাই। সব দল তাকেই পাখির চোখ করে রেখেছে। তাই তো ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে, জনগণের আবেগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আদালতের রায় দেওয়া উচিত। এই অবস্থায় অন্ধ ভক্তদের মাথায় নারকেলের বদলে পাথর ভাঙলেও কিস্যু হবে না!

তবে চিত্রটা সবটাই যে নেতিবাচক তা কিন্তু নয়। সম্প্রতি দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আদালত মুম্বইতে হাজি আলি দরগায় মহিলাদের প্রবেশ নিশ্চিত করেছে। শবরীমালায় চিরকুমার আয়্যাপ্পার যৌন সুড়সুড়ি উপেক্ষা করেও আদালত সব বয়সের মেয়েদের মন্দিরে প্রবেশের পক্ষে রায় দিয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এই রায় না মানার জন্য যেন উঠেপড়ে লেগেছে। সেও তো ঐ ভোটের জন্যেই। তবে আমরা আশাবাদী।

পুনঃ মাথায় নারকেল ফাটানোর ভিডিও সুলভ। তাতে ভক্তদের মাথায় যেভাবে নারকেল ফাটানো হচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে তার মধ্যে কিছু কারিকুরি আছে। একবার মেরে নারকেল ফাটিয়ে ওভাবে জল বার করা সহজ নয়। করতে গেলে যত ‘মোটা’ মাথার ভক্তই হোক, মাথা গুঁড়িয়ে যাবে। সম্ভবত ওরা নারকেলে কিছু কারিকুরি করে রাখে। তাতে অল্প আঘাতেই ফেটে জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে নারকেল বলে কথা, তাই সেইটুকু আঘাতও কম নয়। তাতেও কারও মাথা জখম হওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা। আর হয়ও।— সঃ

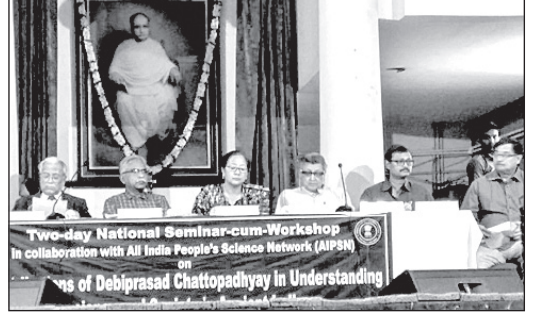
উ না



জন্মশতবর্ষে দেবীপ্রসাদ স্মরণ

ভবানীপ্রসাদ সাহু

বস্তুবাদী ও লোকায়ত দর্শন তথা নাস্তিক্যবাদী বা নিরীশ্বরবাদী মতাদর্শ যে ভারতীয় ঐতিহ্যের অতি মূল্যবান ও অচ্ছেদ্য অংশ তা ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে যুক্তি, তথ্য, প্রমাণের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯৩)। বর্তমান ভারতে কিছু মানুষ ভারতীয় ঐতিহ্যের এই দিকটি উপেক্ষা ও অস্বীকার করে, প্রাচীন ভারতে নানা বিচিত্র দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক তৎপরতাকে বিকৃত করছে, তাতে দেবীপ্রসাদের এই গবেষণামূলক কাজকে বর্তমান প্রজন্ম ও বিদ্বজ্জনের কাছে তুলে ধরাটা অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় কাজটিই হল গত ১৯-২০ নভেম্বর, এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর কক্ষে। এশিয়াটিক সোসাইটি ও অল ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স নেটওয়ার্কের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুদিনব্যাপী জাতীয় আলোচনাসভা ও কর্মশালায়। ভারতের ১৪টি রাজ্যের প্রতিনিধি ও বক্তারা এতে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র কর্মকাণ্ডের সংযোজনা ও পরিচালনা করেন ডঃ অরুণাভ মিশ্র। দেবীপ্রসাদের কন্যা অদিতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতার স্পষ্টবাদিতা, সততা, ঋজু ব্যক্তিত্ব ও মানবিক নানা দিকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেন। আলোচনাসভার প্রারম্ভিক বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূলত দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকেরা দেবীপ্রসাদের জীবন, কাজ ও রচিত গ্রন্থাদি নিয়ে গবেষণাধর্মী, তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করেন। মূল সুরটি ছিল, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে দেবীপ্রসাদের অবদান। উল্লেখ্য, ‘সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি ইন অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া’ নিয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ আছে। অনেক বক্তাই দেবীপ্রসাদের মূল যে বক্তব্য তথা বস্তুবাদী দর্শনের দিকটি বর্তমান ভারতের উদ্বিগ্নজনক পরিস্থিতিতে স্মরণ করার এবং তার ধারাবাহিকতায় আরো অগ্রসর হওয়ার গুরুত্বের কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে যেমন অন্ধপ্রদেশের আচার্য নাগার্জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন আনজাইয়া জানান, ‘হিন্দুত্ব’ শব্দটি আদতে কোনো ধর্ম বোঝাতে ব্যবহৃত হত না, তার মূল সম্পর্ক ছিল এলাকার সঙ্গে। চার্লস গ্রান্ট নাম এক ইংরেজ কর্মচারী ১৮৭৭ সালে প্রথম ‘হিন্দুইজম’-কে বিশেষ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন। (আসলে হিন্দু শব্দটিও বিদেশিদের অবদান— পারসিকরা ‘স’কে ‘হ’ বলে উচ্চারণ করত, তা থেকেই এসেছে হিন্দু শব্দটি) একইভাবে



গীতাকেও ভারতীয়ত্বের প্রতীক করাটা যে অনৈতিহাসিক, তথাকথিত হিন্দুদের মধ্যেও তা নিয়ে অনেক বিরোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এই ধরনের বহু মন্তব্য ও তথ্য আলোচনাসভায় উঠে এসেছে।

কর্মজীবনের শুরুতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কবিতা ও ছোটদের জন্য বিজ্ঞান চেতনার নানা বই লিখলেও পরবর্তীকালে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে গবেষণার ক্ষেত্র বেছে নেন ভারতীয় দর্শনের মধ্যকার বস্তুবাদী ও লোকায়তিক যেসব দিক ততটা পরিচিত নয় বা উপেক্ষিত তাকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। আর এ কাজের জন্যই তিনি দেশে-বিদেশে স্বীকৃত, সম্মানিত। এশিয়াটিক সোসাইটির এই আলোচনাসভার সবটাই ছিল ইংরেজিতে এবং শ্রোতা-বক্তা সবাই ছিলেন অধ্যাপক, গবেষক বা সমাজের উচ্চশিক্ষিত মানুষ। তাই দেবীপ্রসাদের মূল কাজের দিকটি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূলস্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার ও প্রসার করার অসীম গুরুত্ব অনুভব করা যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি তার নিজের পরিসরে দাঁড়িয়ে এই মূল্যবান কর্মসূচি নিয়েছে। কিন্তু অল ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স নেটওয়ার্ক ও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যান্য কিছু কর্মী অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই কাজটি করবেন, তা আশা করা অন্যায্য নয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উৎস মানুষ পত্রিকা ও তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক ছিল। উৎস মানুষ প্রকাশনার তাঁর ‘যে গল্পের শেষ নেই’ বইটি প্রকাশের সময় থেকে আজও সমান জনপ্রিয়। এছাড়াও পাঠকের কাছে দেবীপ্রসাদের সম্পাদনায় উৎস মানুষের ‘প্রতিরোধ’ বইটির চাহিদা এতটুকু কমেনি।

উমা

বেনিয়া-শিরোমণি বাবা রামদেব একই সঙ্গে ধুরন্ধর রাজনীতিকও

ভবানীপ্রসাদ সাহু

আগের সংখ্যার পর

উল্লেখ্য আগে পতঞ্জলি কাজ করত ট্রাস্ট হিসেবে। ২০০৬ সালে রামদেব একে কর্পোরেশন হিসেবে রেজিস্ট্রি করে। আগে প্রিয়াঙ্কা পাঠক-নারায়ণের কথা বলা হয়েছিল। ২০১৬ সালে মুম্বইয়ের এই সাংবাদিককে দিল্লির জুগেরনট বুকস দায়িত্ব দেয় রামদেবের জীবনী লেখার, তিনি লেখেনও। কিন্তু মামলা করে রামদেব তার বিক্রি বন্ধ করে দেয়। কারণ বইটিতে প্রিয়াঙ্কা রামদেবের কিছু রহস্যময়, সন্দেহজনক কাজ ও অপরাধের কথা তুলে ধরেন। যেমন ২০০৫-০৬ সালে একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স ব্যবহার করে রামদেব ও বালকৃষ্ণ হরিদ্বার আশ্রমের আয়ুর্বেদ ফার্মাসি চালাত, সে ব্যবসার অংশীদারও হয়। এই চিকিৎসক হঠাৎ রহস্যজনকভাবে খুন হন। তার কিনারা এখনও হয় নি এবং রামদেব-বালকৃষ্ণকে অভিযুক্তও কেউ করে নি।

দ্বিতীয় রহস্যজনক ঘটনা ২০০৭ সালের। তখন শঙ্কর দেব নামে একজন আশ্রমের মুখ্য গুরু ছিলেন। একদিন রামদেব যখন বিদেশে, শঙ্কর আশ্রম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। লিখে যান, ‘আমি ট্রাস্টের জন্য তোমার (রামদেবের) কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলাম, তা শোধ করতে পারছি না, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো। আমি চললাম।’ এরপর এই গুরুর আর কোনও হৃদিশ মেলে নি! সাত বছর পরে সরকারিভাবে মামলা বন্ধ করা হয়।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল ২০১০-এ। রামদেবের রাজনৈতিক মিত্র রাজীব দীক্ষিত একসময় রামদেবের বিরোধী হয়ে ওঠেন। এই সময়, ঐ বছরের ৩০ নভেম্বর, মাত্র ৪৩ বছর বয়সে হঠাৎ ‘হাট অ্যাটাকে’ তাঁর মৃত্যু হয়। রামদেব তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন বলে গুজব রটে। কিন্তু পুলিশ কোনো তদন্তই করে নি।

অন্যদিকে রামদেবের ভাই রামভগত দাদার স্নেহচ্ছায় পতঞ্জলির সবার ওপর ছড়ি ঘোরানোর অলিখিত দায়িত্ব নেয়। ২০১৩ সালে পতঞ্জলির এক রক্ষীকে চুরির অপবাদ দিয়ে অপহরণ ও আটকে রাখার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে থেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল, রামদেব এটিকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে, সাক্ষীরও

পাল্টি খেয়ে যায়। ফলে রামভগতের কিছুটা হয় নি। তবে ২০১৫-র মে মাসে একটু ঝামেলায় পড়েছিল; পতঞ্জলির খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের ট্রাকচালকদের সঙ্গে রক্ষীদের গণ্ডগোল হয়েছিল। এক ট্রাকচালক মারাও যান। ভিডিওতে রামভগতকে রক্ষীদের উস্কানি দিতে দেখা যায়। ফলে তার ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই দায়ের হয় নি। জনমানসে ও রাজনৈতিক স্তরে গ্রহণযোগ্যতার কারণে এই সব ঘটনায় রামদেবের দিকে আঙুল ওঠার পরেও তার কিছুই এসে যায় নি। রাজনীতির নৌকোয় ওঠার কৌশলও তার ভালই জানা। একসময় সে ছিল ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের কাছাকাছি। কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে কংগ্রেস টালমাটাল হওয়ার সময় নিজের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে ২০১০ সালে নতুন দল গড়ে সব জেলায় প্রার্থী দেওয়ার ও সার্বিক বিপ্লবের (!) কথা ঘোষণা করে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ২০১১-র ৪ জুন দিল্লিতে এক বিশাল ধর্না সমাবেশের আয়োজন করে, সঙ্গে তার অনশন ধর্মঘট। ৪০ হাজার লোক হয়েছিল। কিন্তু আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা এবং সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে গরম গরম কথাবার্তার জেরে পুলিশ সমাবেশে অভিযান চালালে পদপিষ্ট হয়ে একজন মারা যায়। আর রামদেব মহিলার পোশাক পরে ছদ্মবেশে পালানোর চেষ্টা করে। (সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এমন পলায়নের চেষ্টা!)

এদিকে এটিও ক্রমশ বোঝা যায় যে, সন্ন্যাসী, যোগগুরু, পতঞ্জলি-ব্যবসায়ী, গেরুয়াধারী রামদেবকে জনসাধারণ ঠিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করছে না। ফলে রামদেব ব্যবসায় বেশি করে মনোনিবেশ করে। এস কে পাত্র নামে এক খাদ্যবিশেষজ্ঞকে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের মুখ্য আধিকারিক (সিইও) হিসেবে নিয়োগ করে। উনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রামদেবের বাসনা অনুযায়ী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সফল প্রতিযোগী হিসেবে পতঞ্জলিকে প্রতিষ্ঠা করা, কারখানার কাজ-সহ পণ্যের গুণমান, বিপণন ইত্যাদির জন্য কমিটি গঠন করা, বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে নানা বিভাগের কাজকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান।

প্রকৃতপক্ষে এই সময়কালেই পতঞ্জলির ব্যবসায়িক উত্থান

সবচেয়ে বেশি হয় এবং পণ্যের সংখ্যা বেড়ে ৫০ থেকে ৫০০ হয়, আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই ব্যক্তিকেই তার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক পারিশ্রমিক দিত রামদেব। এ কারণে ২০১৪ সালে শ্রী পাত্র পতঞ্জলি ত্যাগ করেন। আর এই ২০১৪-তেই রামদেব তার আসল মিত্র খুঁজে পায়। ঐ অনশন ধর্মঘটের পর কংগ্রেসের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু সে বুঝতে পারে, এখন জনতা পাটিই তার আসল জায়গা। আসলে হিন্দুত্বের রসে জারিত ভারতীয় ঐতিহ্য, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির মতো কথাবার্তা এই হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই মেলে।

২০১৪-তেই রামদেব কটুর হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যৌথভাবে ভোটের প্রচার শুরু করে। এমনই এক রাজনৈতিক সভায় নির্বাচনের প্রার্থী তাকে টাকা তোলার প্রসঙ্গটি মনে করিয়ে দেয়, তখন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা চালু ছিল। রামদেবকে রেগে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি কি বোকা? দেখছ না ক্যামেরায় ছবি উঠছে, এ সময় কেউ টাকার কথা বলে?’ সর্বসাধারণের কাছে রামদেবের গুণের পরিচিতি এবং তার উপর বিশ্বাসকে কাজে লাগালে টাকা তোলার যে সুবিধা হবে, তা এই নেতাদের বুঝতে বাকি নেই। বিজেপি জিতল, মোদি প্রধানমন্ত্রী হল। রামদেব দাবি করল, এই বিরাট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ভিত্তি সে-ই প্রস্তুত করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত থেকে হিন্দুত্ববাদী হিন্দুস্থানে পরিবর্তন! ব্যাপারটি আংশিকভাবে হলেও সত্যি বটেই। মোদি বুঝতে পারল, যোগ আর আয়ুর্বেদকে কাজে লাগালে এ দেশের এমন সব জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী আবেগ চাগিয়ে তোলার পথ মসৃণ হবে। সে নিজে নানারকম কায়দা কসরত দেখিয়ে যোগব্যায়াম করা শুরু করল আর তার ছবি ইলেক্ট্রনিক প্রচারমাধ্যমে দিতে থাকল জাতিসঙ্ঘকে ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’ ঘোষণা করার জন্য উদ্যোগ নিল এবং সফলও হল। যোগকেন্দ্রিক চিকিৎসা কেন্দ্রকে কর-ছাড় দিল। যে মন্ত্রকের অধীনে পতঞ্জলির আয়ুর্বেদ পণ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তথা যোগ ও আয়ুর্বেদকে দেখভাল করা হয়, ঐ মন্ত্রককে ক্যাবিনেট পর্যায়ে উন্নীত করল।

রামদেব বলে, মোদি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু এই বন্ধুত্বের বিনিময়ে সে কিছু সুযোগসুবিধা নেয় নি। কিন্তু ২০১৭-য় রয়টার পরিবেশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মোদি ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্যে জমি কেনার ব্যাপারে পতঞ্জলি কম করে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের ট্যাক্স ছাড় পেয়েছে। নতুন কারখানা আর ওষধির চাষ করার কথা বলে পতঞ্জলি কম করে ২০০০ একর জমি এই সময় সংগ্রহ করেছে।

রামদেব নিজেকে সন্ন্যাসী বলে, পোশাক-আশাকও ঐ ধরনের। নিজের নামে বিরাট কোনো সম্পদ-সম্পত্তিও রাখে নি। তবে

হরিদ্বারে যেখানে থাকে, দেওয়াল ঘেরা ঐ বিশাল জায়গায় সাদা সাদা অনেক ঘর। বিশাল সিংহদরজা। সোফা, আরামচেয়ারে সাজানো ড্রয়িংরুম। ঐ বাড়িতে আমেরিকান সাংবাদিক বেন ক্রেয়ার রামদেবের সাক্ষাৎকার নেন। তিনি সন্ন্যাসীর এমন বাড়িঘর আর পাশাপাশি হরিদ্বারের রাস্তাঘাটে রামদেবের মতো গেরুয়াধারী অসংখ্য ভিথিরির প্রসঙ্গ তুললে রামদেব জানিয়েছিল, ভারতের কোনো ধর্মগ্রন্থে ও শাস্ত্রে সন্ন্যাসীকে ভিথিরির মতো থাকতে হবে এমন কথা কোথাও লেখা নেই। বেন ক্রেয়ার ঐ বিরাট চৌহদ্দিতে দেখেছিলেন প্রচুর ‘মৌমাছি, প্রজাপতি আর অস্ত্রধারী পাহারাদার’ সন্ন্যাসীকে সশস্ত্র পাহারাদার ঘিরে থাকতে পারবে না, এমন কথাও ভারতের ধর্মগ্রন্থে মনে হয় লেখা নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীর পোশাক পরা আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে দাবি করা একজনকে কেন সব সময় অস্ত্র হাতে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে, সে প্রশ্ন মনে জাগেই। অন্যদিকে রামদেব-ভক্ত হরিয়ানা সরকারের পক্ষ থেকে রামদেবকে হরিয়ানায় গিয়ে থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল তাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমমর্যাদায় রাখা হবে, গাড়ি, বাংলা, কর্মচারী, নিরাপত্তা সব দেওয়া হবে। সরকারি এক মুখপাত্র স্থানীয় টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রকে জানিয়েছিলেন, বাবা রামদেব বলেছেন, সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি এসব নিতে পারেন না। আসলে হরিয়ানা সরকার দেখেছিল, রামদেবের মতো লোক ঐ রাজ্যে থাকলে রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু রামদেব যথাসম্ভব দেখেছিল, হরিদ্বার হচ্ছে ভারতের কোটি কোটি হিন্দুদের কাছে পবিত্র এক তীর্থস্থান (বিষ্ণুর পদচিহ্ন নাকি পড়েছিল)। হরিদ্বারে আশ্রম করে থাকার তাৎপর্য আলাদা, তাতে নিজের ইমেজ আর পতঞ্জলির ব্যবসা ঠিক রাখা যায়।

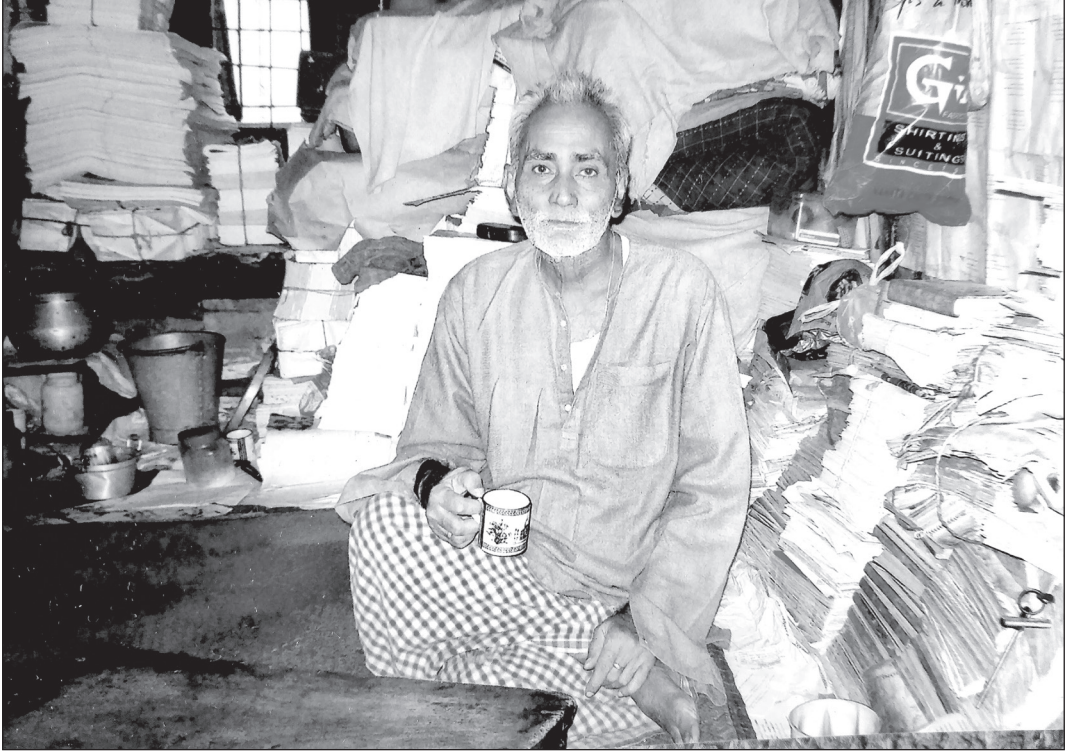
২০১৭ সালে হরিদ্বারে প্রধানমন্ত্রী মোদি ‘পতঞ্জলি রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ঐ সংস্থা পতঞ্জলির বিশাল সাম্রাজ্যের কোহিনূর। এখানে পাশ্চাত্যের আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ গবেষণাগারের গবেষণা ও গুণমান নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ হবে। (না, আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক অলৌকিক ক্ষমতায় নয়!)

মোদি ঐ বিশাল সভায় ঘোষণা করেন, ‘স্বামী রামদেবের ওষধি গাছগাছড়া আপনাদের সব সমস্যা দূর করতে সাহায্য করবে।’ (হ্যাঁ, এইডস, ক্যান্সার, ছুলি থেকে শুরু করে অনাহার, অর্ধাহার, বেকারত্ব, গরুহারানো পর্যন্ত সব সমস্যা!) পাশে তখন হাসিমুখে তৃপ্ত রামদেব বসে! তারপর সরাসরি রামদেবের দিকে তাকিয়ে মোদি বলেন, ‘আমি আমার নিজের উপর যত না বিশ্বাস করি, তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি আপনার ও জনগণের আশীর্বাদের শক্তির উপর।’

‘ড্যাশে’ ‘ড্যাশে’ মাসতুতো ভাই।

উমা

মানুষ-এর প্রতিপালক



নিবারণ সাহা (জন্ম- , মৃত্যু ২০১৮)

সালটা ১৯৭৮-৭৯। বিড়লা মিউজিয়ামে চাকরি করি। সেখানেই আলাপ নিবারণ সাহা'র সঙ্গে। গ্যালারি অ্যাটেন্ডেন্ট। বাড়ি কোচবিহারে। কলকাতায় থাকতেন ৯ নং কার্তিক বোস লেনে, শিয়ালদা বৈঠকখানা বাজারে। এক ছেলে, তিন মেয়ে। চাকরির ফাঁকে বইবাঁধাইয়ের ব্যবসা করতেন। দোতলা বাড়ি। টালির চাল। ঘরের সামনে আক্ষরিক অর্থেই ঝুলন্ত বারান্দা। হাটলে দুলত। এক চিলতে ঘর ভর্তি কাগজের ফর্মা আর বইয়ের স্তুপে। একপাশে হাঁড়ি, কলসী, স্টোভ। রাতে চাটাইয়ের ওপর গড়িয়ে নেওয়া।

নিবারণদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় পরে। একসময় বিড়লা মিউজিয়ামের এডুকেশন অফিসার ও গাইড লেকচারাররা মিলে একটা পত্রিকা প্রকাশ করত 'বিজ্ঞানী' নামে। নিয়মিত এবং বহুদিন বেরিয়েছে। আমি ওদের দলে ভিড়লাম। এই সূত্রেই নিবারণদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। কারণ, ছাপা, বাঁধাই সবই ওকে করতে হত।

১৯৭৮-৭৯ নাগাদ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এল গাইড লেকচারার হয়ে। আলাপ হল। বন্ধুত্বও। ক্যান্টিনে অশোকদাই বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দিল। ১৯৮০-র জানুয়ারি বোরোল 'মানুষ'। তখন না আছে পত্রিকার অফিস, না কিছুর স্টেশনে, পার্কে বসে লেখালিখি না হয় হল। ছাপাই, বাঁধাই, ফর্মা রাখা? সব কিছুর সমাধান করে দিল নিবারণদা। আপাত কৃপণ, শীর্ণকায় মানুষটার ভেতরটা যে অত বড় তার আগে জানতেই পারি নি। ওর এক চিলতে ঘরেই আশ্রয় জুটেছিল। কী অত্যাচারই না করেছি। আমাদের চেয়ে পত্রিকাকে কোনো অংশে কম ভালবাসত না। যতদিন বেঁচেছিল উৎস মানুষ ছিল ওর প্রাণ। সব কাজ ফেলে আমাদের কাজ করেছে। নিবারণদার সান্নিধ্য না পেলে অশোকের স্বপ্নের 'মানুষ'-এর জন্ম হত কি না সন্দেহ। তাই ওর প্রয়াণে আপনজন বিয়োগের ব্যথায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

পবন মুখোপাধ্যায়

সাধারণের হৃদয়ের সুরক্ষা একমাত্র পথ

গৌতম মিস্ত্রি

গরিবগুর্বোর রোগভোগের বোঝা হালকা করার লক্ষ্যে জনদরদী সরকারবাহাদুর সম্প্রতি নব অবতারের স্বাস্থ্যবিমার (আয়ুর্ভান ভারত) কথা ঢাকটোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছেন। জনগণের অভিভাবকদের কাছ থেকে জনগণকে সুস্থ রাখার কথা, নীরোগ থাকার উপায়ের কথা, আমরা বড় একটা শুনি না। এদিকে রোগ হবার সমস্ত উপাদান, আমাদের রুগণ করার পরিমণ্ডল সাজিয়ে-গুছিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। এই রোগের সঙ্গে বসত করার ব্যাপারটার জন্য আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের দুর্বল অর্থনৈতিক ঐতিহ্য আর রাষ্ট্রীয় মদতে (মতান্তরে উদাসীনতায়) বহুজাতিক মুনাফাখোর চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার প্রবণতাকে দায়ী করা যায়। পশ্চিমী দুনিয়া তাদের অর্জিত জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতায় বিজ্ঞানের প্রয়োগে, গোষ্ঠীগতভাবে রোগের নিবারণকে একমাত্র উপায় মেনে নিয়ে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগে ইদানীংকালে প্রায় ৪০ শতাংশ হৃদরোগ নিবারণ করতে সমর্থ হয়েছে। স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে (চিকিৎসার বিষয় আলাদা) উন্নত দুনিয়ার বিপরীতে হেঁটে ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব ও হৃদরোগে মৃত্যুহার এখন উর্ধ্বমুখী।

রাষ্ট্রনায়কগণ সেইসব উন্নত দেশের চিকিৎসা-প্রযুক্তি চড়া মূল্যে কেনার বাজার বজায় রেখে, স্বাস্থ্যবিমার টাকায়, মানে আমাদের পকেটের টাকা বিমাব্যবসার সমীকরণে সংগ্রহ করে, আমাদের মতো (যারা সেই স্বাস্থ্যবিমা ক্রয় করতে পারবে) অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে না-পড়া আবার এগিয়েও না-থাকা মুষ্টিমেয় মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন। স্বাস্থ্যবিমার টাকা জোগাড়ে অসমর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা উহ্য থেকেই গেল। অথবা তাঁরা হয়ত অন্য কিছু ভাবছেন, কিন্তু আমাদের অনেকেই এটা বেশ একটা কল্যাণকর প্রয়াস বলেই হয়ত ভাবছি। সেই প্রয়াসে আদৌ হৃদরোগের আসন্ন মহামারী ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না। কলেরা, বার্ড ফ্লু, আন্ট্রিক বা ডেঙ্গির মতো মহামারী রাষ্ট্রনায়কদের বড় বেকায়দায় ফেলে, কারণ সেগুলোর ক্ষয়ক্ষতি তাৎক্ষণিক। সচেতন জনগণ তাদের সীমিত অনুভবের পরিসরে সেই নাটকীয় পরিণতি দেখে বিগড়ে যায়। হৃদরোগের মহামারীর ক্ষয়ক্ষতি তাৎক্ষণিক নয়,

তেমন নাটকীয়ও নয়। বরং আমাদের সেই ক্ষতিতে বাঁ-চকচকে পাঁচতারা হোটেল সদৃশ বেসরকারি হাসপাতালের স্বার্থরক্ষা হয়ে যায়। হৃদরোগ নিবারণ সফল বলে প্রমাণিত সস্তা এবং এক রাষ্ট্রীয় ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগ। এতে চিকিৎসাপণ্যের ব্যবসার স্বার্থ পূরণ হবার উপায় নেই।

হৃদরোগে মৃত্যু ও ভোগান্তি এড়ানোর চিকিৎসা বনাম প্রতিরোধের তিনটি স্তর। যে স্তরটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেটার জন্য আমরা স্বাস্থ্য বনাম মিলিটারি খাতে বাজেটের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গলাবাজি করি, ভাবি একটু বেশি শতাংশের বাজেট বরাদ্দ হলেই বুঝি মুশকিলআসান হয়ে যাবে। এই স্তরটা তৃতীয়স্তরের চিকিৎসা। অত্যন্ত খরচে এই চিকিৎসায় নামী দামী বেসরকারি হাসপাতালের গুরুগম্ভীর পরিবেশে বাঘা বাঘা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ যমের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে মরণাপন্ন হৃদরোগে আক্রান্ত অসহায় মানুষকে কোনোমতে বাঁচিয়ে তোলেন। হৃদরোগের লক্ষণ দেখা দেবার পরে এর প্রয়োগ বলে এই চিকিৎসার নাম সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। আমাদের মধ্যে, যাদের সামর্থ্য আছে, চিকিৎসাবিমার পলিসি কেনার সময় এই রোগের চিকিৎসার খরচের কথা মাথায় রেখে প্রিমিয়ামের অঙ্ক নির্ধারণ করি। অর্থাৎ সম্ভাব্য হৃদরোগের সুরক্ষার জন্য আমরা এই তৃতীয়স্তরের চিকিৎসার বাইরে ভাবতে শিখিনি। আমাদের অভিভাবক হিসাবে রাষ্ট্রও এর বাইরে হয় শেখেনি বা শিখতে চায়নি।

তৃতীয়স্তরের আগের আর একটা স্তর আছে, যেটা আজকাল মুষ্টিমেয় সচেতন সচ্ছল নাগরিকেরা দেরিতে হলেও ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। মনে করুন, আপনি একটু মোটা আর রাস্তায় হাঁটার সময় আপনি হেঁচট খেলেন। আগে হয়ত সামলাতে পারতেন, এখন শরীরটা তেমন বেশে নেই বলে আছাড় খেলেন। আপনার গোড়ালি মচকে গেল। আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন। গোড়ালির চিকিৎসা করার সময় ডাক্তার প্রথামাফিক আপনার রক্তচাপ মেপে বললেন, আপনার নাকি হাই প্রেশার। রক্তপরীক্ষা করে দেখা গেল, আপনার রক্তে সুগারও বেশি। আপনি গুগল করলেন মোবাইলে, চলে গেলেন আরও বড় ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার আপনাকে রক্তের চাপ আর সুগার নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধ

দিলেন। উনি আবার রক্তের কোলেস্টেরল কমানোরও ওষুধ দিলেন। মচকানো গোড়ালির দৌলতে আপনার দৈনিক এক গাদা ওষুধ খাওয়ার খরচ আর বাক্সি নিয়ে মুখে পড়লেন এই ডেবে যে, এই ওষুধের বোঝা আপনাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। এই শুকনো ঝামেলার জন্য আপনার কোনো কষ্ট না হলেও আপনাকে এই ওষুধগুলো ব্যবহার করে যেতে হবে, আপনার প্রিয় মার্টিন বিরিয়ানি আর রাবড়ি খাওয়া ছাড়তে হবে, নিয়ম করে অ্যালার্ম বাজিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে পাড়ার পুকুরটাকে তিন চক্রর পাক খেতে হবে। ডাক্তার বলেছেন, গুগলও বলেছে, এসব করলে নাকি হার্ট অ্যাটাক, মাথার স্ট্রোক, কিডনি ফেলিওর ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগগুলো আটকানো যাবে। সবাই যখন বলছে, তখন এগুলো মিথ্যে নয়। এটা দ্বিতীয়স্তরের সুরক্ষা।

এই যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল, মেদবহুল চেহারা, হাঁটাহাঁটির অভ্যেস না থাকা, ধূমপান করা— এমন ছ-সাত রকমের বৈশিষ্ট্য থেকেই হৃদরোগের মতো ঐ সব মারণাঙ্ক রোগভোগের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় সেই কিশোর বয়স থেকেই। এই রোগগুলো যথেষ্ট সময় দেয় আমাদের সাবধান হবার জন্য। এই রোগ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিভাষায় ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান মানুষের হুঁশ দেয়তে হলেও এই রিস্ক ফ্যাক্টরের চিকিৎসা হল দ্বিতীয়স্তরের সুরক্ষা। হৃদরোগ আমাদের ছুঁয়ে দেবার আগে এই সুরক্ষা প্রয়োগ করা হয় বলে পরিভাষায় এর নাম ‘প্রাইমারি প্রিভেনশন’। এই চিকিৎসা কেবল জল দিয়ে কয়েকটা ট্যাবলেট খাওয়াই নয়, সঙ্গে স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস আর নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়ামও (মর্নিং ওয়াক, ট্রেড মিলে হাঁটা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি) আর তামাকের ব্যবহার বর্জনও আছে। সারাজীবনের জন্য এই দ্বিতীয়স্তরের সুরক্ষার বায়নাঙ্কা মারণাঙ্ক রোগগুলোকে ঠেকিয়ে দিতে পারে,

এটা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে। তবে কিনা এটা বেশ খরচের আর সারা জীবন এই বায়নাঙ্কা বয়ে বেড়ানোর দায় থেকে যায়। এর চেয়ে সস্তার আর কম ঝামেলার উপায়ও আছে। সেটা হল প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষা। প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষার নামেই একটা বিভ্রান্তির আভাস আছে। আগের পরিচ্ছেদে উল্লিখিত দ্বিতীয়স্তরের সুরক্ষা হল প্রাইমারি প্রিভেনশন। এই সুরক্ষায় প্রচারের আলো যত বেশি পড়ে, তত বেশি ওষুধ ব্যবসার লাভ। নামের বিভ্রান্তিতে আমজনতার কাছে প্রাইমারি প্রিভেনশনের

আগের সস্তার সুরক্ষার বিষয়টা চাপা পড়ে যায়। প্রাইমারি প্রিভেনশনের আগের অর্থাৎ আমার স্তরবিভাগ অনুযায়ী এই দ্বিতীয়স্তরের সুরক্ষার আগের, অবহেলিত আসলি সুরক্ষার স্তরটি হল ‘প্রাইমারি প্রিভেনশন’। প্রাইমারি প্রিভেনশন সুরক্ষার স্তর বিভাজনের কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক, সস্তা ও কার্যকার ‘প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষা।’

প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগতস্তরে অতিরিক্ত কোনো খরচ নেই। কেবল প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় অথবা গোষ্ঠীগত উদ্যোগ। এই সুরক্ষায় দ্বিতীয়স্তরের সুরক্ষায় উল্লিখিত ঝুঁকির কারণগুলিকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে অত্যন্ত খরচের সারা জীবনের ওষুধ খাওয়ার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি মেলে। মনে করুন, আপনার চল্লিশ বৎসর বয়সে উচ্চ রক্তচাপ বাড়ল, রক্তে শর্করা আর কোলেস্টেরলও স্বাভাবিকের উর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে গেল (এসব

ঝামেলা আবার একসঙ্গেই আসে)। আপনি অন্তত আরও ৩০ বছর বাঁচতে চাইলে (সেটা আবার আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল নয়) আপনাকে বাকি জীবনে আপনাকে অন্তত তিন লাখ টাকার ওষুধ খেতে হবে। ক্রমবর্ধমান ওষুধের সংখ্যা, তার ক্রমবর্ধমান দাম, ফি বছর রক্তপরীক্ষা করার খরচ আর ডাক্তারের ফিয়ার কথাটা হিসাবে আনলাম না। কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পরে বিভিন্ন খাতে পেনশনের টাকার বরাদ্দের হিসাবটা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। অথচ প্রাথমিকস্তরের এই সুরক্ষাবিধি আশাতীতভাবে সফল বলে প্রমাণিত। প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষার প্রতিরোধটাও আবার স্কুলের প্রাথমিক ক্লাসে বা তারও আগে, মানে নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন ক্লাস থেকেই প্রয়োগ করতে হয়। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চা ইত্যাদির জন্য আমাদের আলাদা করে অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। পৃথিবীর কয়েকটি জনজাতিতে

এই অভ্যেস আলাদা করে তৈরি করতে হয় না, তবে সেরকম জনজাতি নগণ্য। সেটা নগণ্য বলেই ওষুধশিল্প এখনও একটি লাভজনক ব্যবসা। হৃদরোগ নিবারণের জন্য প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষা বিশ্বব্যাপী প্রযুক্ত হলে ওষুধশিল্প অলাভজনক হয়ে পড়বে। ওষুধ ও বৃহত্তর চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের এটাই ভরসা, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন খুব শীঘ্র বিশালভাবে প্রয়োগ হবার সম্ভাবনা নেই। সেটা দুঃখজনক হলেও সেটাই বাস্তব!

ম্যালেরিয়া হলে কুইনিনের বড়ি খেয়ে সামাল দেওয়া যায়, সেটা

তৃতীয়স্তরের চিকিৎসা। মশারি খাটিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যাবে, যেটা হল দ্বিতীয়স্তরের সুরক্ষা। মশার বংশ নির্বংশ করতে পারলে মশারি ছাড়াই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যাবে, মশারির জন্য খরচ বা খাটুনি করতে হবে না। এটাই প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষা বা ‘প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশন’। এই প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশনের জন্য উন্নত দেশেও এখনও কোনো সার্বজনীন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা শুরু হয়নি।

প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশনের পক্ষে এমনই একটি অতি ক্ষুদ্র, মূলত পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে আমার কথাটা শেষ করব। এই ধরনের আরও বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অবশ্য চালু আছে। এই কর্মকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য হল প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষা বা প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশনের গোষ্ঠীগত উদ্যোগের সফলতা প্রতিষ্ঠিত করা।

আমেরিকা নিবাসী স্পেনের এমন এক চিকিৎসকের নাম ভ্যালেন্টিন ফুস্টার (Valentin Fuster, American-Spanish cardiologist)। আমেরিকা ও সারা বিশ্বের বিদগ্ধ চিকিৎসক মহলে এই প্রৌঢ় শিক্ষক-চিকিৎসকের খ্যাতি আছে। উনি বেশ কয়েকটি নামজাদা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের গোষ্ঠীর সাম্মানিক পদ আলোকিত করেছেন ও করছেন (American Heart Association, World Heart Foundation, Institute of Medicine of the National Academy of Sciences)। উনি কয়েকবার কয়েকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন (Editor-in-Chief of the Journal of the American College of Cardiology)।

মানুষের অভ্যাস গড়ে ওঠার সময় তার শৈশব। ‘শৈশবেই মানুষের অভ্যাস নির্মাণ হয়, হৃদরোগ নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ঐ শৈশবেই দিতে হবে’— এই মতে তিনি কেবল বিশ্বাসীই নন, এটা তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। ওঁর মতে, এই ধরনের উদ্যোগে শিশুদের নিশানা করা উচিত। ওঁর পরিচালিত দুটি প্রকল্পে স্পেনে ২০ হাজার ও কলম্বিয়ায় ২৫ হাজার তিন থেকে ছয় বৎসর বয়সের শিশুদের উনি হৃদরোগ নিবারণের জন্য বেছে নিয়েছেন। ঐ শিশুদের সঙ্গে তাদের বাবা-মা, অভিভাবক ও তাদের স্কুলের শিক্ষকদের সামিল করেছেন স্বাস্থ্যকর খাবার, অ্যারোবিক শরীরচর্চা ও সমগোত্রীয় খেলাধুলায় প্রেরণার উন্মেষের বহুবিধ কর্মকাণ্ডে। মাপেট ডাক্তার নামে একটি চরিত্রের সৃষ্টি করে টেলিভিশন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪০ থেকে ৭০

ঘণ্টার এক কর্মকাণ্ডে এই শিশু ও তাদের সঙ্গে জড়িত সাবালক মানুষদের সামিল করা হয়েছে ও এখনও হয়ে চলেছে। শিশুদের হার্ট আর শরীর সম্বন্ধে ওদের মতো করে, খেলার ছলে সুস্থ থাকার রহস্য বোঝানো হচ্ছে এই প্রকল্পে। আমেরিকা, স্পেন আর কলম্বিয়ায় বারিয়ো সিসামো (Barrio Sésamo, English: Sesame Neighborhood) নামে একটি টেলিভিশন সিরিয়াল (<https://youtu.be/w-VRcSpqI3w>) সম্প্রসারণ এই প্রকল্পের একটি অঙ্গ।

শৈশবে অভ্যাস গড়ে ওঠার সময় হৃদরোগ নিবারণের বীজ তিনি বপন করার চেষ্টার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, পাশাপাশি অন্য স্কুলের শিশুদের, যাদের ঐ কর্মকাণ্ডে সামিল করা হয়নি তাদের চেয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুদের স্বাস্থ্যকর সুঅভ্যাস নির্মাণ আশাব্যঞ্জক। এই শিশুরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তাদের ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস একটি সাবলীল ক্রিয়ায় পরিণত হয়ে যাবে। অনুমান করাই যায়, এই প্রকল্প, যেটা কিনা নিখরচায় হৃদরোগ সৃষ্টি হবার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো ঠেকিয়ে দেবে, তখন উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক ইত্যাদি রোগ বহুলাংশে প্রতিহত হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য, সেই উন্নত পৃথিবীতে শহরের বেসরকারি বড় বড় হাসপাতালগুলো ব্যবসা গোটাতে, করোনারি অ্যাজিওপ্লাস্টি আর হার্টের বাইপাস অপারেশনের প্রয়োজন বিরল হয়ে পড়বে।

বহুজাতিক স্টেন্ট প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো লালবাতি জ্বালাবে। একদিকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে আপাতভাবে জনপ্রিয় নয় এমন একটি কর্মকাণ্ডে মানুষের অভ্যাস বদলের কঠিন প্রচেষ্টা, যার সুফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ বছর, আবার অন্যদিকে হাসপাতাল আর তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্তরের চিকিৎসার (secondary and primary prevention) সরঞ্জাম উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত— এই দ্বিবিধ প্রতিকূল কারণে ও সর্বোপরি অজ্ঞানতার কারণে রাষ্ট্রীয় এবং গোষ্ঠীয়স্তরের প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা (primordial prevention) একটা স্বপ্ন হিসাবেই থেকে যাবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলির মারণ থাবা আমাদের দৃষ্টান্তমূলক আঘাত করে।

সদ্যসমাপ্ত একটি আন্তর্জাতিক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে উন্নত দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের



হালহকিকত শুনতে গিয়েছিলাম। তৃতীয়স্তরের চিকিৎসা (হার্টের রোগ শুরু হয়ে পরে যেটা করা হয়) ও হৃদরোগের উপকরণ (রিস্ক ফ্যাক্টর) শরীরে বাসা বাঁধলে সেটার চিকিৎসা বা হৃদরোগের প্রাইমারি প্রিভেনশনের জন্য জোরদার রিস্ক ফ্যাক্টরের (উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে উচ্চ মাত্রায় কোলেস্টেরল, ধূমপান, স্থূলতা, পরিশ্রম-বিমুখতা ইত্যাদির) চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা চলছিল। প্রশ্ন করলাম, আপনারা প্রাইমারি ডায়াবেটিস বা রিস্ক ফ্যাক্টর ঠেকানোর কথা কম বলেন কেন? উত্তরটা আমার জানাই ছিল— চিকিৎসা-বিজ্ঞানচর্চা ও যুগ কোম্পানির দয়াদাক্ষিণ্য, আর্থিক সহায়তা বিনা হয় না। সরকারি মনোযোগ, উৎসাহ ও অর্থ-আনুকূল্য এই সকল কর্মকাণ্ডে দেশেহারা দর্শকের ভূমিকায় থাকে মাত্র। তা, যে চিকিৎসাবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হল, তিনি একবাক্যে সহজ সরল সত্যটা বলেই ফেললেন, ‘স্বাস্থ্যকর খাবার, উপযুক্ত শারীরিক শ্রম/শরীরচর্চা করলে আর ধূমপান না করলে বিরল কয়েকটি জিনিসটিতে ক্ষেত্র ছাড়া, হৃদরোগের অস্তিত্ব পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যেত না।’

হৃদরোগের সমস্যার প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষের কুঅভ্যাসের ফল। স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার উপযুক্ত সময় প্রাথমিক স্কুলে যাবার আগেই। প্লে স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিশুদের এই অভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদের বাবা-মা, পরিবারের বয়স্করা ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপরে নির্ভর করে। প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্যকর খাবার ও শারীরিক পরিশ্রমে গুরুত্ব আরোপ। শিশুরা স্বভাবজাত ভাবেই সদ্য অনুভব করা পৃথিবীর বৈচিত্র্য জানতে বেশি উৎসাহী থাকে। এমনিতেই তারা ছটফটে। ছুটে বেড়াতে চায়। টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, চকোলেট, শক্তি ও ভিটামিনে ভরপুর কৌটা ও বাল্ল ভরা চটজলদি শিশুর খাবার ইত্যাদি শিশুর দায়িত্বে-থাকা অভিভাবকদের কাজ সহজ করে দেয় বটে, কিন্তু শিশুর ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য নষ্ট করা শুরু করে দেয়, হ্যাঁ, ঐ শৈশবেই। আজ যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষটির হৃদরোগ ধরা পড়ল, তাঁর রোগের সূত্রপাত কিন্তু শুরু হয়ে গেছে শৈশবেই, তাঁর অজান্তে।

মানুষ উইপোকাকে ব্যঙ্গ করে বলেন ‘পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে’। মানুষের কুঅভ্যাসের পাখা ক্রমশই তার বিস্তার বাড়াচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, তার উপলব্ধি বিদ্যা মানুষকে স্বাস্থ্যরক্ষার দিশা দেখাতে সমর্থ; তা সত্ত্বেও সেটার সার্বজনীন প্রয়োগে ঘাটতি থেকে যায়। সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন কয়েকটি সহজ অভ্যাসের নির্মাণ—

(১) দৈনিক অ্যারোবিক শরীরচর্চা (সপ্তাহে ন্যূনতম ১৫০ মিনিট, মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রায় একনাগাড়ে হাঁটা বা দৌড়ঝাঁপ করার খেলা অথবা ব্যায়াম)

(২) খাবারে তন্ত (ফাইবার) সমৃদ্ধ জটিল শর্করার শস্যাদানা, ফল, লেগুম (ছোলা, রাজমা), কাঁচা বাদাম, না-ভাজা রঙিন সবজি ও না-ভাজা মাছের প্রচুর্য। জৈব তেল থাকবে ক্যালোরির মাপে ৩০ শতাংশের মতো আর তাতে থাকবে সর্বোচ্চ শতকরা ৭-১০ শতাংশ সম্পৃক্ত ফ্যাট। বর্জন করতে হবে প্রক্রিয়াকৃত সরল শর্করা (চিনি, পালিশ করা সাদা চাল, ময়দা), ১০ শতাংশের বেশি সম্পৃক্ত ফ্যাট ও ট্রান্স ফ্যাট।

এই ধরনের খাবারে শৈশব থেকে অভ্যস্ত হলে, মানুষ প্রাপ্তবয়সেও স্বাস্থ্যকর খাবার উপভোগ করতে পারবে।

(৩) সব রকমের তামাক ও সিগারেটের ব্যবহার বর্জন। এইগুলো সফল ও সার্বজনীনভাবে প্রয়োগের জন্য কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লাভ হবে না। জনপ্রিয় নয়, দরকার সঠিক জ্ঞানে পুষ্টি দূরদর্শী জনহিতকর রাষ্ট্রের দৃঢ় পদক্ষেপ। এটাই একমাত্র উপায়।

স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বাড়িয়ে বা স্বাস্থ্যবিমা নামক আর একটা ব্যবসাকে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনলেও নিবারণযোগ্য কিন্তু আসন্ন হৃদরোগের মহামারী ঠেকানো যাবে না। প্রাথমিকস্তরের সুরক্ষা বা প্রাইমারি ডায়াবেটিস প্রিভেনশন ছাড়া সাধারণ মানুষের হৃদরোগের বোঝা কমবে বলে মনে হয় না।

উ মা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেন্নাই), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উয়ুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন

নম্বর: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

বিষ যখন ধূপের ধোঁয়ায়

অর্ণব ঘোষ

ধূপ আমাদের জীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একে সুন্দর গন্ধ, তায় পুজোআর্চায় লাগে, তাই ধূপ সম্পর্কে একটা ভক্তিবাবও তৈরি হয়। কবিরা নানাভাবে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে এর গৌরব আরও বাড়ান। যেমন, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত এক গানের কলি, ‘আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছু নাহি ঢালে’, নজরুল লিখছেন, ‘আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ’, আধুনিক গানের লাইনে পাই ‘ধূপ চিরদিন নীরবে জ্বলে যায়, প্রতিদান সে কি পায়!’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাকে নিয়ে আমরা বেশ সংবেদনশীলও। গন্ধ ভালো না হলে দোকানির সঙ্গে ঝগড়াও বাধাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে নিজের জীবনধূপের কথা বলেছেন। তা আমার আলোচ্য নয়, আমি নির্ভেজাল ধূপের কথাই বলব। পাঠক হয়ত বলবেন, ধূপ নিয়ে আর বলার কি আছে! এ তো সাধারণ একটা কাঠি, গায়ে মসলা মাখানো। জ্বালালে খানিক

ধোঁয়া আর সুন্দর গন্ধে মাতোয়ারা করে তোলে। ঠাকুর-দেবতার পুজোয় লাগে। প্রয়াত কারো ছবির সামনে শ্রদ্ধা জানাতেও জ্বালি। কখনও এমনই ঘর সুগন্ধে ভরতে। এতে তো বিপদের নামগন্ধও নেই!

স্বীকার করছি, আপাতভাবে এতে কোনো বিপদের গন্ধ নেই। কিন্তু সুগন্ধের নিচেই চাপা পড়ে আছে গভীর বিপদ। সেই

বিপদের কথা আমার কল্পনাপ্রসূত নয়, বলছেন বিজ্ঞানীরা। Eisevier, Wiley, Springer ইত্যাদি স্বনামধন্য বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু গবেষণাপত্রে গবেষকেরা ধূপের সুগন্ধের পেছনে লুকিয়ে-থাকা বিষের প্রভাব নিয়ে যা তথ্য দিয়েছেন, তা বেশ চিন্তার বিষয়, উদ্বেগেরও।

ধূপকাঠির ব্যবহার আমাদের মতো প্রাচ্যের দেশে একচেটিয়া। শুধু ভারত নয়, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলি যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলামধর্মের বিশেষ প্রভাব রয়েছে, সেই সব দেশেও ধূপকাঠির ব্যবহার লক্ষণীয়। পশ্চিমের দেশগুলিতে এর ব্যবহার সেরকমভাবে দেখা যায় না, তাই এসবের অপকারিতা বা উপকারিতা নিয়ে ওরা তেমন মাথাও ঘামায় না।

ধূপ তৈরি করতে মোটামুটিভাবে লাগে (ওজন-অনুপাত হিসাবে)— কাঠের গুঁড়ো ও ভেষজ উপাদান (২১%), গন্ধদ্রব্য (৩৫%), আঠালো পদার্থ (১১%) এবং বাঁশ বা নারকেল পাতার কাঠি (৩৩%)। ধূপের ধোঁয়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে এর বিষাক্ত দিকটির একটা আভাস সহজেই পাওয়া যায়, কারণ এর অধিকাংশ বায়বীয় উপাদান হয় গ্রিন হাউস গ্যাস নতুবা কার্সিনোজেনিক জটিল জৈব যৌগের আওতায় পড়ে। তাইওয়ানের চ্যাং কুং ইউনিভার্সিটি এবং আমেরিকার ইস্ট টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির যৌথ গবেষণায় সদ্য উঠে-আসা রাসায়নিক বিশ্লেষণটি এইরকম— ১. গ্রিন হাউস গ্যাস— (CO, CO₂, NO, SO₂); ২. উদ্বায়ী জৈবযৌগ (বেনজিন, টলুইন, জাইলিন, অ্যান্ড্রাইড এবং পলিসাইক্লিক অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন)।



এই রাসায়নিক গঠন কিন্তু বহুল চিন্তার বিষয়। ধূমপানের আনুষঙ্গিক দ্রব্যেও কিন্তু এগুলো থাকে। তফাত কেবল নিকোটিনের উপস্থিতিতে। উল্টোদিকে ধূপে-থাকা বেশ কয়েকটি বিষাক্ত উপাদান কিন্তু সিগারেট বা বিড়িতে থাকে না। ভাবছেন, সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে তো কর্কট রোগগ্রস্ত ফুসফুসের ভয়াল ছবি এবং সাবধানবার্তা

থাকে, এদিকে ধূপের বাস্কে কেবল ফুলের বা দেবদেবীর ছবি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। ধূমপানের প্রসঙ্গই যখন উঠল, তখন একটা তুলনা কিন্তু সহজেই চলে আসে। কারণ দুটো জিনিসের প্রভাবের পেছনেই কারণ একটাই— ধোঁয়া। প্রশ্ন উঠতেই পারে, দুটোই কি সমান ক্ষতি করে? করলেও কী কী ভাবে করে? আসুন জেনে নিই যে, ধূপের ধোঁয়ার কোন কোন প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর পড়ে।

যে কোনো ধোঁয়ার, বিশেষত যে সব ধোঁয়ায় জটিল জৈব যৌগের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাদের মানবশরীরের ওপর প্রভাব মূলত দুই জায়গায় পড়ে, ১. শ্বাসনালী এবং ২. ফুসফুস। ধূমপান বা স্মোকিংয়ের দুটো ভাগ করা হয়— অ্যাক্টিভ ও

প্যাসিভ। সিগারেটের কথা ধরুন। যিনি সরাসরি সিগারেট টানছেন তিনি অ্যাক্টিভ স্মোকিং করছেন। ধোঁয়া সরাসরি সিগারেট থেকে তাঁর নাক দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালী ও ফুসফুসে যাচ্ছে। আর যিনি সিগারেট টানছেন না, কিন্তু ধূমপায়ীর পাশে রয়েছেন, ধোঁয়া তাঁর নাক দিয়েও ভেতরে ঢুকছে। তিনি পরোক্ষ ধূমপায়ী। এই পরোক্ষ ধূমপানকেই বলে প্যাসিভ স্মোকিং। বলে রাখা ভালো যে, বহুলপ্রচলিত প্যাসিভ স্মোকিং থেকে ক্ষতির ধারণাটি বেশ গোলমেলে। সে যাই হোক, গবেষণায় এটা প্রমাণিত, অ্যাক্টিভ স্মোকিং বেশি ক্ষতিকারক। ধূপের ধোঁয়ার ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটাকেই কিন্তু প্যাসিভ স্মোকিং বলা চলে। আর তাতেই সে যা ক্ষতি করার করে। এর ক্ষতির পরিমাণ ‘টাইম অফ এক্সপোজার’, মানে কতক্ষণ ধোঁয়ার মধ্যে থাকা হচ্ছে, তার সঙ্গে সমানুপাতিক। শ্বাসনালী এবং ফুসফুসের ওপর ধোঁয়ার প্রভাবটা মূলত দুটো জিনিসের ওপর নির্ভরশীল, প্রথমত, বস্তুকণার পরিমাণ এবং দ্বিতীয়ত, উপস্থিত বায়বীয় উপাদানের রাসায়নিক ধর্মাবলী। ধূপের ধোঁয়ায় উপস্থিত বস্তুকণার পরিমাণটি মোটামুটি ৪৫ মিগ্রা/গ্রা (সিগারেটের চেয়ে ৪.৫ গুণ বেশি)। স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাবগুলি নির্ভর করে, বস্তুকণাগুলি সাধারণত মানব শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে কত গভীরে প্রবেশ করছে, সেই অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। সাধারণত, যে কণাগুলির ব্যাস ১০ মাইক্রো মিটারের চেয়ে কম, চিন্তা সেগুলোকে নিয়েই বেশি, কারণ তারা শুধু ফুসফুসের গভীরে প্রবেশই করে না, সেখানে গিয়ে আস্তানাও বাঁধে। সাধারণত ১০-২.৫ মাইক্রো মিটার ব্যাসের কণাগুলোকে চিকিৎসার ভাষায় ‘থোরাসিক কোর্স পার্টিকলস’ বলা হয়। ২.৫-০.১ মাইক্রো মিটারের কণাগুলিকে বলা হয় ‘ফাইন পার্টিকলস’ এবং ০.১ মাইক্রো মিটারের নিচের ব্যাসের হলে ‘আলট্রা-ফাইন’ বলা হয়।

মূল সমস্যা কিন্তু এই শেষের দুটিকে নিয়ে, কারণ এরা ফুসফুসের গভীরতম প্রকোষ্ঠে (আলভিওলাই) গিয়ে জমা হয়। ধূপের ধোঁয়া এই বস্তুকণা ও বায়বীয় পদার্থের এক কিছুত মিশ্রণ, তাই আলাদা করে শুধুমাত্র কণাগুলির প্রভাব দেখাটা কঠিন, যদিও উপস্থিতির হারে, ধূপের ধোঁয়ায় ওই ‘থোরাসিক কোর্স পার্টিকলস’ এবং ‘ফাইন পার্টিকলস’-ই বেশি, তাই দুয়ে-দুয়ে চার করতে বোধ হয় খুব মাথার ঘাম ফেলতে হয় না।

এবার চলুন আলাদা আলাদা করে উপস্থিত বায়বীয় রাসায়নিকগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা যাক— ১. গ্রিন হাউস গ্যাস: বিশ্ব-উষ্ণায়নের বাজারে এই ভয়াবহ নামটির সঙ্গে যে কোনো ওয়াকিবহাল নাগরিকই বোধ করি পরিচিত। এরা শুধু বিশ্বসংসারে যে বরফ গলিয়ে আর তাপমান বাড়িয়ে বিপদ বাড়াচ্ছে, তাই নয়, আমাদের কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, পালমোনারি ডিসফাংশন ইত্যাদির পেছনেও এদের দখলদারি

লক্ষণীয়।

২. উদ্বায়ী জৈবযৌগ: উদ্বায়ী জৈবযৌগগুলির কেবামতি কিন্তু আরো আশ্চর্য। এরা শুধু কার্ডিওভাসকুলার আর পালমোনারিতেই থেমে নেই, এরা একেবারে ফুসফুসের কোষে-কোষে ঢুকে আণবিক স্তরে কাজকন্মো করে। বংশগতির মূল একক হিসেবে আমরা ডিএনএ-কে জানি। কোনো রাসায়নিক অথবা বিকিরণজনিত অথবা ডিএনএ-র প্রতিলিপি রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কোনো উৎসেচকের কর্মবিফলতার দরুন কোনো আণবিক পরিবর্তনকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘পরিব্যক্তি’ (মিউটেশন) বলি। এই পরিব্যক্তি একটি প্রজন্মে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, আবার পরবর্তী প্রজন্মেও হস্তান্তরিত হতে পারে (সেক্ষেত্রে সেটি বংশগত হয়ে যায়)। এই মিউটেশন যেমন অভিযোজনের অন্যতম কারণ, তেমনিই যে কোনো ক্যান্সার বা অন্যান্য জেনেটিক রোগের মূলও বটে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, যে সব সেবাইতেরা মন্দিরের বন্ধ কক্ষে অতিরিক্ত সময় কাটান, তাঁদের মধ্যে ফুসফুসের কর্কট রোগ শেষ ১০ বছরে সর্বাধিক এবং রোগের প্রাদুর্ভাবের পেছনে ‘টাইম অফ এক্সপোজার’ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে ধূপকাঠির ব্যবহার তো কয়েকশো বছর ধরে প্রচলিত, তাহলে শেষ ১০ বছরে হঠাৎ করে একে খলনায়ক হিসেবে ঠাওরানো হচ্ছে কেন? এ প্রশ্নে জানাই, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ক্লিনিকাল রিসার্চ, বিশেষত কর্কট রোগ সম্বন্ধীয় গবেষণা শেষ ১০ বছরে যত হয়েছে, তা আগে হয়নি (বিশেষত প্রাচ্যে)। এর আরো একটি দিক রয়েছে। শেষ ১০ বছরে বিশ্বস্তরে এক বিশাল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের আমরা সাক্ষী। বিশ্বায়ন এবং এই ‘সোসিও-ইকনমিক বুম’কে বোধহয় কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা চলে না। পণ্যের বাজারীকরণ এবং তার ব্যবহার বহুলাংশে বেড়েছে, ধূপ তার ব্যতিক্রম নয়। শুধুমাত্র তাই নয়, উপাসনাস্থলে ভক্তসমাগম এবং উৎসবের প্রাচুর্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, এই সত্যতাকেও বোধহয় অগ্রাহ্য করা চলে না। রোগের কারণ বিশ্লেষণ করা তো হল, এবার রোগের বৈচিত্র্যের ওপরেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক। মূলত নিম্নলিখিত রোগগুলি অতিরিক্ত ধূপের ধোঁয়ার কারণে হয়ে থাকে বলে সন্দেহ করা হয় (যে সম্পর্কে অবশ্যই তথ্যপ্রমাণ আছে)—

১. বিভিন্ন প্রকার শ্বাসজনিত অ্যালার্জি। আমাদের দৈহিক প্রতিরোধতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি করে তাকে অনেক রকম ভাগে ভাগ করা যায়, যার মধ্যে রসসংক্রান্ত প্রতিরোধ বা হিউমরাল ইমিউনিটি অন্যতম। অ্যালার্জি জাতীয় রোগের সাথে ইমিউনোগ্লোবিউলিন টাইপ-ই ও বিভিন্ন রকমের ইন্টারলিঙ্কিং অণু বিশেষভাবে জড়িত। এদের পরিমাণ কোনো কারণে

বেড়ে গেলে বিভিন্ন রকমের অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া বেড়ে যায়। ইন্দোনেশিয়ার একদল বৈজ্ঞানিক তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, ধূপের ধোঁয়ার অতিরিক্ত সংস্পর্শে গর্ভবতী মা ও সন্তানের বিভিন্ন রকম অ্যালার্জিক জটিলতা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হাঁফানিজনিত সমস্যা ও অ্যালার্জিক ডার্মাটাইটিস বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

২. কর্কট রোগ: কর্কট রোগের পেছনে ধূপের ভূমিকা আগেই আলোচনা করেছি। সব বয়সের ফুসফুসজনিত কর্কট রোগ ছাড়াও রক্তজনিত কর্কট রোগের পেছনেও এর ভূমিকা পাওয়া গেছে। এছাড়াও ধোঁয়ায় উপস্থিত N-Nitroso যৌগ বিশেষ ন্নায়বিক তন্ত্রের কারসিনোজেন হিসেবে পরিচিত এবং শিশুদের ব্রেন টিউমার, স্ট্রোকাইটিক গ্লিওমা এবং প্রিমিটিভ নিউরোএক্সোডার্মাল টিউমারের জন্য দায়ী।

ইন্দোনেশিয়ার একদল বৈজ্ঞানিক তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, ধূপের ধোঁয়ার অতিরিক্ত সংস্পর্শে গর্ভবতী মা ও সন্তানের বিভিন্ন রকম অ্যালার্জিক জটিলতা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হাঁফানিজনিত সমস্যা ও অ্যালার্জিক ডার্মাটাইটিস বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

সচেতনতার নামে আমাদের ভাঙামোর শেষ নেই। জনৈক এক টিভি চ্যানেলে সন্ধে হলেই শুরু হয় দৈনিক আতঙ্ক-পালা। যেখানে জল খেলেও মৃত্যু হতে পারে এবং বেঁচে থাকাটাও যে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, তা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়। সবজাস্তা সঞ্চালক থেকে হোমরাচোমরা বিজ্ঞানী, ডাক্তার সকলেই চোখ পাকিয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে ভয় দেখান। দর্শকমহল থেকেও উদ্ভট সব প্রশ্নবাণ ছুটে আসে। একবিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতার অগ্রগতির এক সাম্প্রতিক নিদর্শন (পড়ুন প্রহসন) আর কি। ওসব যাঁরা দেখেন, দেখুন। আতঙ্ক-বিলাস ভোগ করতে হয় করুন। তাতে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। তবু বলি, একটু চোখ-কান খোলা রাখার সময় এসেছে। সতর্ক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিষের ছোবল থেকে কারও রেহাই নেই, মুকেশ আস্থানি বা রতন টাটা হলেও নয়। তাই সাবধানে থাকুন, সুস্থভাবে বাঁচুন ও বাঁচতে দিন। ধর্মের নামে তো অনেক কিছুই হল, এবার না হয় সিগারেটের সঙ্গে সঙ্গে ধূপকাঠিটাকেও ছাড়ুন, স্লোগানটা পাল্টে বোধহয় ‘স্মোক ইজ ইনজুরিয়াস টু হেল্থ’ হওয়া উচিত।

উমা

একটু জল পাই কোথায় বলতে

পারেন!

নীলাভ রায়

Water, water everywhere, Nor any drop to drink; স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের কবিতার এই বিখ্যাত লাইনটা কিছতেই মুখস্থ হচ্ছিল না কলকাতার এক অভিজাত স্কুলের বছর ১৪-র পড়ুয়ার। পড়ায় মগ্ন হয়ে সে ভুলেই গেছিল যে ওয়াটার পিউরিফায়ারটা গত ১০ মিনিট অন হয়েই রয়েছে; অবঝরে ঝরে পড়ছে পরিশ্রুত পানীয় জল। অপরদিকে তার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে প্রায় একই ঘটনা— অকেজো এক টিউবওয়ালের পাশেই উপচে পড়ছে টাইম কলের বেলাগাম জল। হৃন্দপতন ঘটাচ্ছে রাজপথ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া এক লরি, যার পেছনে মোটা হরফে জ্বলজ্বল করছে: ‘ভাড়া কম দিও না সোনা, জল বাদে সবই কেনা!’

অর্থনীতির ছাত্র হওয়ার সুবাদে পড়ার প্রথম দিকেই চোখ বুলিয়েছি ‘Water-Diamond Paradox’-এ, যা বলে— জীবনধারণের ক্ষেত্রে জল হীরের চেয়ে বেশি মূল্যবান হলেও এক টুকরো হীরে ঘড়া-ঘড়া জলের চেয়ে বেশি দামি। এর কারণ? জলের তুলনামূলক জোগান নাকি হীরের চেয়ে বেশি। তবে বাস্তবের জলাভাব কিন্তু যেন অন্য ইঙ্গিত করছে।

২০১৫-র ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম ‘জলাভাব’কে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ানক ঝুঁকি আখ্যা দিয়েছে। যার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই উঠে আসছে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার মতো সব পরিসংখ্যান। তবে কেবল পরিসংখ্যান নয়, পৃথিবী যে এক দারুণ সঙ্কটকে ডেকে আনছে, তার আভাস পাওয়া যায় শতাব্দীর গোড়াতেই বলিভিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা ‘জল’কে ঘিরে তৈরি হওয়া এক গৃহযুদ্ধ থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই পররাষ্ট্রনীতির চোখরাঙানির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভীষণ জলসঙ্কট। তাই জলের এই বিপুল ঘাটতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন জোগাবে বলে মনে করেন বেশ কিছু চিন্তাবিদ।

আর বিশ্বব্যাপী এই সমস্যার মানচিত্রে অচিরেই জায়গা করে নিয়েছে ভারত। নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী

ভারত আজ ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক জলসঙ্কটের মুখোমুখি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) মতে, ২০৪০ সালের মধ্যে সারা দেশে কোনো পানযোগ্য জল আর অবশিষ্ট থাকবে না। প্রত্যেক বছর প্রায় দু লাখ ভারতীয়ের মৃত্যুর কারণ হবে এই জলের ঘাটতি। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে জলের চাহিদা জোগানের দ্বিগুণ হতে পারে যা ভারতীয় অর্থনীতিকে একেবারে টলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। দেশের এই দুর্দিনে যে রাজ্যের পরিস্থিতি সবচেয়ে শোচনীয়, সেই রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৭-র এক সমীক্ষা বলছে যে, দেশের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে যে একজন পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত, সেই মানুষটি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। দেশের যে সমস্ত গ্রামীণ জনপদ পানীয় জলের আকালে দিন গুজরান করছে, তা নিয়ে কোনো তালিকা তৈরি হলে রাজস্থানের পরেই নাম উঠে আসবে পশ্চিমবঙ্গের নাম। রাজধানী নগরী কলকাতাও তার প্রচণ্ড ব্যস্ত রোজনামচার মাঝেও টের পাচ্ছে এই জলসঙ্কটের। কলকাতা হল সেই শহর, যেখানে গড় মাথাপিছু দৈনিক জলের ব্যবহার প্রায় ৬০০ লিটার, যা জাতীয় গড়কে (১৩৫ লিটার) পেছনে ফেলে দিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ, যাদবপুর ও বেহালার একাধিক এলাকায় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভার কলে জলে আসছে ঠিকই, কিন্তু জলের চাপ এতই কম যে পর্যাপ্ত জল পাচ্ছেন না কেউই। উত্তরও এই ভোগান্তির কথা একেবারে নাকচ করে দিচ্ছে না। অথচ শহর কলকাতায় জলের জোগানে কোনো কমতি নেই, এমনটাই বারংবার দাবি করে আসছে কলকাতা পুরসভা (যা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ২০২৬-এ কলকাতাকে মডেল মেগাসিটিতে পরিণত করবার পরিকল্পনা করেছে।) কিন্তু তবুও আজ প্রবল জলাভাবে খুঁকছে শহর।

এর প্রধান ও অন্যতম কারণ হল নির্বিচারে জলের অপব্যবহার ও জলের বিশাল অপচয়। যদিও নগরায়নের হাত ধরে গড়ে-ওঠা ফ্ল্যাট কালচার জলস্রবকে ক্রমশ নিম্নমুখী করছে, তবে নাগরিক সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে এই মাল্টিস্টোরিড বিন্ডিংগুলো এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করেন অনেকে। অন্যদিকে একথাও ঠিক যে, এই জলের অপচয় রোধ করলে পরোক্ষভাবে এই নাগরিক সভ্যতাকেই আমরা বাঁচাতে পারি। কিন্তু একবার কলকাতা বা শহরতলির পথে হাঁটলেই নজরে আসবে, রাস্তার কল থেকে গড়িয়ে পড়ছে অবিরাম জলের ধারা। আবার শহরের আরাম থেকে বেরিয়ে মফস্বল বা গ্রামের দিকে তাকালেই ভেসে উঠছে পরস্পর বিরোধী দুটি জলছবি: প্রচণ্ড বর্ষায় যে গ্রামগুলো টাইটসুর হয়ে ওঠে তিস্তা, দামোদর বা ভাগীরথীর জলে, সেখান থেকেই আবার কিছু মাস পরেই ভেসে আসে দুর্বিষহ পানীয় জলকণ্টের হাহাকার, কারণ

বেশিরভাগ জলই তখন আর পানযোগ্য থাকে না। সঙ্গে দোসর হয় আর্সেনিকের হানা। এদের মধ্যে মাঝে মাঝেই খবরের শিরোনামে উঠে আসে পুরুলিয়া। যেখানকার ছবিটা রাজস্থানের চেয়ে কিছুমাত্র আলাদা নয়। অশোক গুলাটি ও গায়ত্রী মোহনের সাম্প্রতিক কালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কৃষিক্ষেত্রে অবাধে জলের অপচয়, যা দেশের ৭৮ শতাংশ বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করে। অবশ্য এই গভীর সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে সরকার সাজিয়ে রেখেছে একগুচ্ছ প্রকল্পের ডালি। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাহাড়ি এলাকার জন্য ‘বর্নাধারা’, ‘জল ধরো, জল ভরো’-র মতো বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রকল্প, বিজ্ঞানমণ্ডের তাগিদে আয়োজন করা হচ্ছে সচেতনতা শিবিরের, বর্জ্য জল শোধন করে ঘরে ঘরে পানীয় জল সরবরাহ করা, আবার প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষকে সমস্যার গভীরতা বোঝাতে উপস্থাপন করা হচ্ছে পথনাটিকা। কিন্তু শহরে মানুষ যেমন জলসংরক্ষণের বিষয়টিকে গাঁয়ো বলে মনে করছে, তেমনি গ্রামের মানুষও এই নিয়ে ভাবতে নারাজ। কোনো প্রক্রিয়াই আমাদের কানে জল ঢোকাতে অক্ষম, কেন না কথাতাই আছে ‘জলের দর’।

যখনই এই বিরাট জলসঙ্কটের কিষ্কিৎ আঁচ করতে পারছি আমরা, ২৪ কি খুব বেশি হলে ৭২ ঘণ্টা জল সরবরাহ বন্ধ থাকার সুবাদে, তখনই চোখে আঙুল দাদা হয়ে ‘নন্দ ঘোষ’ বানাচ্ছি সরকারকে। তাই অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ মনে করছেন, জলের মিটার বা জলকর হ্রাস এই অপচয়ের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটতে পারবে। তবে বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন, জলসঙ্কট একটি সমষ্টিগত সমস্যা, যেখানে ব্যক্তির কিছুই করার থাকে না। যা থেকে জন্ম নিচ্ছে এমন এক মানসিকতা যেন আমাদের স্নানঘর কিংবা রান্নাঘরের কলটাও সরকার থেকে এসে বন্ধ করে দিয়ে যাবে! এই পরমুখাপেক্ষী মনোভাব আমাদেরকে ভুলিয়ে রাখছে এই সত্যকে— আমার এই উদাসীনতা পাশের বাড়ির মানুষটার ওপর যতটা প্রভাব ফেলবে, ঠিক ততটাই প্রভাবিত করবে আমাকেও। ভুলে চলবে না যে প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

জীবনের উৎসব আজও পালন করে আসছি আমরা, কারণ জীবনের উৎস আজও, ‘যখন চাই, তখন পাই’, কিন্তু উৎসবের রেশ খুব বেশিদিন স্থায়ী হবে না যদি না জলের ব্যবহারে আমরা আরো বেশি যত্নশীল হই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কস্তুরিরঙ্গনের মতে, মানুষকে বোঝাতে হবে যে পরিস্থিতিটা জটিল নয়, মারাত্মক— যে ভয়ানক রূপের জন্য দায়ী আমাদের অসংবেদনশীল কার্যকলাপ। নইলে পরে সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’-এর চাতক পথিকের মতো আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তে বলে উঠতে হবে, ‘দাদা, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?’

উমা

শানেল-দিয়র-এর দেশ এক (অ)পরিচ্ছন্নতার ইতিবৃত্ত

তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী

কোকো শানেল বা ত্রিস্ত্রিয়ঁ দিয়রের নামাঙ্কিত বিবিধ সুগন্ধী ও বিলাসদ্রব্যের জন্য ভুবনজোড়া যে দেশের খ্যাতি, সেই ফ্রান্সের মানুষ নিয়মিত যে গোসল করবেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। ২০১৫-র একটি মার্কিন সংস্থার হিসেব বলছে, প্রাত্যহিক স্নানে ফরাসিরা একজন গড় মার্কিন ও ভারতীয়ের সমকক্ষ। তবে চুলে শ্যাম্পু দেওয়ার বাতিকের জন্য তাঁরা রিপোর্টটিতে ঈষৎ সমালোচিত হয়েছেন। তবে সে বাসগৃহই হোক বা কর্মস্থল, রাস্তাঘাটই হোক বা দোকানবাজার— ফরাসিদের পরিচ্ছন্নতা-বাতিক সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, ফরাসি সমাজে পরিচ্ছন্নতার হাল-হকিকত চিরকালই কি এমন ছিল? নাকি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তার বদল ঘটেছে? আমরা স্কল পরিসরেই মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ অবধি ফ্রান্সের স্বাস্থ্যবিধি ও (অ)পরিচ্ছন্নতার বিবর্তনের ছবিটি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

জলপরীদের মতো সারাক্ষণ জলকেলি না করলেও, জলে যে ফরাসিদের অরুচি ছিল না, তার সামান্য বহন করে ফ্রান্সের মধ্যযুগের শহরাঞ্চলের বারোয়ারি স্নানাগারগুলো। সাধারণত সেখানে একই পরিবারের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একসঙ্গে স্নান করার ব্যবস্থা ও প্রচলন ছিল। নগ্নতা নিয়ে আদিখ্যেতা তখনও ইউরোপের মজ্জায় ঢোকেনি। শহরে বাবু বন্ধুবান্ধবরা পরিবারের লোকজনের সামনে দিব্যি নগ্ন হয়ে আঙুর চিবোতে চিবোতে, তাসপাশা খেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাথটাবে কাটাতেন।

ফরাসিরা জলের এই ব্যবহার শিখেছিল রোমানদের কাছ থেকে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় আটশো বছর অবধি জারি ছিল এই অবগাহন প্রথার। জল সম্পর্কে ভীতিটা তৈরি হল তার একশো বছর পর, চতুর্দশ শতকে। এক বিরাট মহামারীর ফলশ্রুতিতে। সেই মহামারীতে সারা ইউরোপ প্রায় উজাড় হতে বসেছিল। পরবর্তী পাঁচশো বছর আর তারা জলের ধার মাড়ায়নি। মনে করত, জলই এই মহামারীর অন্যতম উৎস। স্নান থেকেই যত রাজ্যের অসুখ শরীরে এসে জোটে। তাছাড়া মধ্যযুগে শুধু

ধনীরাই উষ্ণ জলে স্নানের বিলাসিতা দেখাতে পারত। কারণ কয়লা তো দূরস্থান, কাঠের আগুনও সাধারণের সামর্থ্যের বাইরে ছিল। সম্রাট শার্লমাইনের বন্ধু ও শিক্ষক এইনহার্ডের বিবরণ থেকে জানা যায়, সম্রাট বন্ধু-আত্মীয় জুটিয়ে একসঙ্গে ‘হট বাথ’ ও ‘স্টিম বাথ’-এর খুব ভক্ত ছিলেন। তবে গাঁ-গঞ্জের চাষাভুষো মানুষ গ্রীষ্মকালে আশপাশের নদী বা পুকুরেই স্নান করে নিতেন। সপ্তদশ শতকে চতুর্দশ লুইয়ের সময়ে এমনকি অভিজাতদের বাড়িতেও মলমূত্রত্যাগের নির্ধারিত কোনো ঘর বা স্থান ছিল না। একাজের জন্যে ছোট ছোট পাত্রের ব্যবস্থা থাকত। বাবু বা বিবিদের সহসা বেগ চলে এলে, যেকোনো একটা ঘরে কিঙ্কর-কিঙ্করীদের ডাক পড়ত। পাত্র এগিয়ে দিয়ে তারা সেখানেই অপেক্ষা করত। মহারাজা তো কমনোডে বসেই মন্ত্রী সান্ত্রীদের সঙ্গে মিটিং সারতেন। বাথরুম পায়খানা, স্নানের জল, নিকাশি ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। এখনকার ভাষায় পটি হয়ে গেলে, বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে পাত্র খালি করে আসা হত। যে যেখানে পারত, স্থানে-অস্থানে একটু ফাঁকফোঁকর পেলেই হালকা হয়ে নিত। রাস্তাঘাটে পরিচ্ছন্নতা বলে কিছু ছিল না। মলমূত্র তো বটেই, এঁটো-কাঁটা, মড়া পশুপাখির পচাগলা দেহ, এসবও যত্রতত্র পড়ে থাকত। ভার্সাইয়ের রাজবাড়িও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তিন হাজার পারিষদ সমেত রাজ পরিবারের জন্য দুটি মাত্র খাটা-পায়খানা ছিল। তাও যে খুব ব্যবহৃত হত তা নয়। এক বিবরণ থেকে জানা যায়, বলনাচের আসরে জনৈক কাউন্ট সাহেব মহারানীর হাতখানি ছেড়ে দেওয়ালে সাঁটা মহার্য্য ওয়াল পেপারের ওপরেই মূত্রত্যাগ করে আবার নাচতে ফিরে এলেন। উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে জঞ্জাল ও আবর্জনা পরিহারের ধারণাটাই ছিল না তখন। প্রাসাদের খাটা-পায়খানাও দৈনিক পরিষ্কার হত না। খুব উপচেটুপচে উঠলে অনেক সময় পিপে ভর্তি করে বিষ্ঠা নিয়ে ঢেলে দিয়ে আসা হত প্রাসাদ-অঙ্গনেই। কালেভদ্রে শহরের বাইরে।

চতুর্দশ শতকের বিউবনিক প্লেগ জনিত মহামারীর পর স্নান ব্যাপারটা তো প্রায় উঠেই গেল। তবে অভিজাতরা সকালবেলায় ঘরে কিছুটা পরিষ্কার হবার চেষ্টা করত। কীভাবে? ছোট এক খণ্ড সাদা পরিষ্কার কাপড় একটা বাটির জলে সামান্য ভিজিয়ে, তা দিয়ে মুখে ঘাড়ে খুব আলতো করে বোলানো হত, পাছে বিবিধ রক্তপথে রোগের ভূত শরীরে না প্রবেশ করে। বিশেষত ভয় ছিল, জলের মাধ্যমে যৌনরোগ, বিশেষত সিফিলিসে আক্রান্ত হবার। সেইসময়ে আরেকটা অদ্ভুত ধারণা ছিল মানুষের; ত্বকের ওপর একটু ময়লার আস্তরণ থাকা নাকি ভাল। দেহকে অনেক অসুখবিসুখ থেকে তা রক্ষা করে। মাথা ধোয়ার প্রচলন ছিল

না। শ্যাম্পুর তো নয়ই। চুলে ভাল করে ব্রাশ করা হত। আর দেওয়া হত পাউডার, চুলের চিটচিটে ভাব কমানোর জন্য। স্নানের অভাবে শরীরে স্ভাবতই দুর্গন্ধ হত। দুর্গন্ধ ঢাকতে বড়লোকেরা শরীরে রকমারি সুগন্ধির বন্যা বইয়ে দিত। মনে করা হত, সুগন্ধ দুর্গন্ধকে বিতাড়িত করে শরীরকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। কারণ শরীরের দুর্গন্ধ নাকি অসুখের সব থেকে বড় বন্ধু।

নোংরা নয় কিন্তু, দুর্গন্ধ! আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে, রোগ-জীবাণুর ধারণা তখনও তৈরি হয়নি। মনে করা হত, রোগ সঞ্চারিত হয় এক ধরনের অদৃশ্য বাষ্প বা ঘোঁয়ার মাধ্যমে। কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি যেকোনো ছোঁয়াচে রোগই বস্তুত একধরনের ভূতুড়ে বাষ্প। গ্রামের চাষাভূষাদের পক্ষে গরমজলে স্নান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা স্বপ্নের অতীত ছিল। অতএব তাদের দৈনন্দিন স্নানের গল্প তবু একটা ছিল। তবে তা একেবারেই ঋতুনির্ভর। অর্থাৎ শ্রেফ

গ্রীষ্মটুকু বাদ দিলে জল-সংসর্গের প্রশ্নই ওঠে না। জামাকাপড় সারা বছরে মাত্র দুবার কাচার রীতি ছিল। আর কাচাকুচি খুব সুসাদ্য কর্ম ছিল না। দিনতিনেকের কমে সেকাজ সমাধা হত না। পুরুষদের দুটোর বেশি জামা থাকত না। তা কাচা হত বসন্তে আর হেমন্তে, একবার করে। বিরাট কড়াইয়ে জল গরম করে তাতে পরিবারের সমস্ত জামাকাপড়, চাদর ইত্যাদি ফোটানো হত, তারপর তার ভেতরে ছাই বা স্কার জাতীয় পদার্থ ফেলে কাচা হত। আমাদের দেশে এই ছবি মোটেই অপরিচিত নয়, বরং এক ঘটমান বর্তমান। কড়াইয়ে কাপড় ফোটানোর এই পর্যায়ের নামকরণ হয়েছিল ‘নরক’। নরকের কুস্তীপাকে পাপী যেমন সেক্ত হয়, পোশাক-আশাকেরও যেহেতু সেই দশা। ‘নরক’

হয়ে গেলে জামাকাপড়কে নিয়ে যাওয়া হত ‘পাপক্ষালন’-এ। সেখানে চলত উত্তম-মধ্যম ধোলাই। প্রত্যেক গ্রামে, শহরে তো বাটেই, ধোলাইখানা থাকত। সেখানে কাজ করতেন প্রধানত মেয়েরা। শহরের এমন এক ধোবিখানার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় এমিল জোলায় বিখ্যাত উপন্যাস L’Assomoir (পানশালা)-এ। শহরে পরিধেয় বস্ত্রের শুভ্রতা অভিজাতের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হত। অর্থাৎ ধনী অভিজাতরাই পরিষ্কার পোশাক পরত, সাধারণ লোকের ওসবের বালাই ছিল না।

চতুর্দশ লুইয়ের সময়ে প্যারিস শহরের পরিচ্ছন্নতার কিছুটা উন্নতি ঘটে। শহরে গড়ে তোলা হয় উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা,

ছোট এক খণ্ড সাদা পরিষ্কার কাপড় একটা বাটির জলে সামান্য ভিজিয়ে, তা দিয়ে মুখে ঘাড়ে খুব আলতো করে বোলানো হত, পাছে বিবিধ রক্তপথে রোগের ভূত শরীরে না প্রবেশ করে। ধারণা ছিল মানুষের; ত্বকের ওপর একটু ময়লার আস্তরণ থাকা নাকি ভাল। দেহকে অনেক অসুখবিসুখ থেকে তা রক্ষা করে।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং শ্যেন নদীর ধার বরাবর নৌকোর ওপর ধোবিখানা। নদীর জলে শহরের বর্জ্য ময়লা সরাসরি গিয়ে পড়ার ফলে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এসব রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সম্যক হাতিয়ার তখনও পর্যন্ত মানুষের হাতে আসেনি। উপরন্তু টিবি, বসন্ত, টাইফয়েড, আন্ট্রিক, প্লেগে উজাড় হয়ে যেতে থাকে দেশ। মানুষের গড় আয়ু ২৫ পেরোত কিনা সন্দেহ! এখন তা ৮৫ ছুঁয়েছে!

সে রাজাই হোক বা প্রজা, রোগ-সংক্রমণ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। চতুর্দশ লুই নিজেই টাইফয়েড আক্রান্ত হন। কিন্তু বেঁচেও যান! মানুষ বিশ্বাস করত যে, রাজাকে রক্ষা করেন স্বয়ং ঈশ্বর! সেকালের হাসপাতাল শুধু অভিজাত আর রাজ পরিবারের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সেখানে ডাক্তাররা অনেক সময় রোগীর মূত্র মুখে নিয়ে তার স্নান বুঝে রোগ নির্ণয় করতেন। রোগ সারানোর ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন পদ্ধতি ছিল। কনুইয়ের কাছে

বাহু যে জায়গাটায় ভাঁজ হয়, ছুরির সাহায্যে সেখানে সামান্য চিরে রক্তপাত ঘটানো। এই রক্ত নির্গমন-প্রক্রিয়ার জন্য অনেক সময় জোঁকও ব্যবহার করা হত। মনে করা হত, মানুষ অসুস্থ হয় রক্তে গ্লেভা-পিভুজনিত ধাতু বৈষম্যের কারণে। রক্তক্ষরণের মাধ্যমে রোগীর দেহে ধাতুসাম্য ফিরিয়ে আনা যাবে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে, ফরাসি বিপ্লবের পর, ফরাসি জীবন থেকে মহামারীর প্রকোপ কিছুটা দূরে সরে যায়, জল পুনরায় স্বহিমায় ফিরে আসে। বাড়িতে ধাতুনির্মিত বাথটাবের প্রচলন হয়। এই বাথটাবগুলো হালকা, স্নান হয়ে গেলে অন্যত্র সরিয়ে রাখা যায়। তখন তো বাথরুমের চলন ছিল না, স্নান করতে ব্যবহৃত হত বাড়ির যেকোনো একটা ঘর। বড়ঘরের লোকেরা

স্নানের সময় জলে খানিকটা দুধ ঢেলে দিত। তাদের ধারণা ছিল যে, এতে ত্বকের উপকার হত তো বটেই আরেকটা কাজও হত। স্নানের সময়ে বাবু-বিবীরা ইয়ার-বন্ধু জুটিয়ে আড্ডাও দিতেন, কখনো বা ছোটখাটো মিটিংও সারা হত বাথটাবে শুয়ে। দুধ ঢালার কারণ ছিল জলকে অস্বচ্ছ করে দেওয়া, যাতে অবগাহিত দেহের নগ্নতা খানিকটা আড়াল পায়। তবে অতখানি জল গরম করে, বয়ে এনে বাথটাবে ঢেলে স্নানের ঝঙ্কাট ছিল বিস্তর। গৃহপরিচারকের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। অতএব, সাধারণত ধনীগৃহেই এই অবগাহন স্নান সম্ভব ছিল। নিকটবর্তী নদী বা জলাধার থেকে জল বয়ে নিয়ে এসে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ করত ভারীরা। খুব মুষ্টিমেয় মানুষের ঘরে পাইপের জল ছিল। প্যারিসে এই পাইপের জলের রূপকারের নাম জাক কঁস্তুঁত্যাঁ পেরিয়ে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে প্যারিসে পাইপের জল ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে শুরু করে। তবে গ্রামের সমস্ত বাড়িতে পাইপের জল পৌঁছতে ফ্রান্সে আরও একশো বছর, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আশির দশক অবধি, অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

গ্রামের মানুষ নদীতেই স্নান করত। কিন্তু প্যারিসে শ্যেন নদী শহরের যাবতীয় নোংরা বর্জ্যের প্রভাবে এতই কলুষিত ছিল যে সেখানে গা ডোবানোই প্রায় অসম্ভব। তাই তৈরি হয়েছিল বারোয়ারি স্নানাগার। সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে এবার সাবানের ব্যবহার শিখল। প্রথম দিকে স্নানেও ব্যবহৃত হত কাপড়কাচার সাবান। স্নান করে গায়ে পাউডার লাগানোর চল ছিল। দাঁতমাজার গুঁড়োর প্রচলনও ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে। প্রথম মাজন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তামাক দিয়ে তৈরি আমাদের দেশের গুড়াকু-টাইপ এক বস্তু। এই কালপর্বে এক প্রকারের দাঁতমাজার ব্রাশও প্রচলিত হতে শুরু করেছিল।

ঊনবিংশ শতক ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের শতক। খনি ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ ঘিরে অনেক শহর এই কালখণ্ডে গড়ে উঠতে থাকে। ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীও এই শতকের ফসল। অত্যন্ত দ্রুত হারে কলকারখানা পত্তনের সঙ্গে তাল রেখে শ্রমিকসংখ্যা বাড়ছে অথচ সেই অনুপাতে শহরগুলোর পরিষেবার উন্নতি হচ্ছে না। নিদারুণ অবস্থায় শ্রমিকেরা বেঁচে আছেন। এই সর্বহারা শ্রমিক-জীবনের জীবন্ত চিত্র এঁকেছিলেন ভিক্টর উগো, তাঁর অনবদ্য উপন্যাস ‘লে মিজেরাবল’-এ।

তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮০৮-১৮৭৩) সময় থেকে শহরের, বিশেষত, প্যারিসের ভোল বদলাতে শুরু করে। তখনও প্যারিসের বহু জায়গায় কাদা চটচটে অপারিসর রাস্তাঘাট, ঘিঞ্জি গলি, নোংরা বস্তি। সে সময়ের প্যারিসের সাধারণ এক বাড়ির ছবি এইভাবে ফুটে উঠছে মোপাসঁর কলমে— ‘জানলা দিয়ে অন্ধকার অপারিসর একটা উঠোন দেখা যায়, অনেকটা চিমনির

মত। গরিবগুর্বোদের ঘরের দুর্গন্ধ ওপর দিকে ঠেলে ওঠে সেই চিমনি বেয়ে।’ বা ‘শহরের একদম কেন্দ্রে ছোট্ট এক অন্ধকার গলির মতো জায়গা, দুই উঁচু পাঁচিলের মাঝে পাঁকভর্তি এক ডোবা বিশেষ। সেই গলির শেষ প্রান্তে একটা জীর্ণ কাঠের দরজা, দুটো পেরেকের সঙ্গে জংধরা তার দিয়ে আটকানো।’ তৃতীয় নেপোলিয়ন ঘটনাচক্রে ছেলেবেলায় লন্ডনে ছিলেন। শিল্পায়িত লন্ডনের রূপ তাঁকে মোহিত করেছিল। সেই মডেলে তিনি প্যারিসকে গড়তে চাইলেন। ১৮৫৩ সালে বারঁ ওসমান নামে এক রাষ্ট্রনেতার হাতে প্যারিসকে লন্ডন বানানোর গুরুদায়িত্ব তুলে দিলেন সম্রাট। ওসমান প্যারিসকে একেবারে ঢেলে সাজালেন। টানা চওড়া রাস্তা, আলো-বাতাস খেলা বাড়িঘর তৈরি হল পুরনো ঘুপচি শহরকে ভেঙেচুরে। পুনর্নির্মিত হল জল সরবরাহ ও নিকাশি-ব্যবস্থা। শহরে ধনী ও মধ্যবিত্তের ঘর এবং শহরতলিতে শ্রমিক আবাস। এই হল ওসমান মডেল। বিখ্যাত কবি শার্ল বোদল্যার ব্যথিত হয়েছিলেন প্যারিসের এই ভোল বদলে, নিজেকে নির্বাসিতের মতো বোধ করেছিলেন এই অচেনা শহরে। তাঁর ‘মরাল’ (Le Cygne) কবিতাটি সেই নির্বাসনের গল্প বলে। ওসমান-পূর্ব যুগে বাড়িতে একটা ঘরের মধ্যেই গোটা একটা পরিবার বসবাস করত। রান্না থেকে শোয়া, সব কাজ এক ঘরে। এখন শোয়া, বসা, খাওয়া, কাজ অনুযায়ী ঘরগুলো আলাদা হয়ে গেল। শ্রমিকের ঘরে তখনও পাইপের জল পৌঁছয়নি। শ্রমিকের, বিশেষত, খনিশ্রমিকের জীবনে স্নান তো এক অবশ্যকৃত্য এবং সে কাজের জন্য তাঁর নির্ধারিত স্থানটি হল রান্নাঘর, সেখানে বাড়ির গিল্লির সহায়তায় সমাধা হয় তাঁর স্নানপর্ব।

এই পর্বে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। লুই পাস্ত্যর রোগসৃষ্টির পেছনে, শরীর অভ্যন্তরের ধাতু বিপর্যয় নয়, শরীরের বাইরের জীবাণুর ভূমিকার কথা প্রথম উল্লেখ করেন। এবং জীবাণুকে নির্মূল করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পাস্তোরাইজেশন নামে যা পরিচিত। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর আগে অসুস্থ রোগীকে চাপা বন্ধ ঘরে রাখা হত। মনে করা হত, বাতাস রোগ বহন করে আনে। পাস্ত্যরের তত্ত্ব ঠিক এর বিপরীত কথা বলল, বাতাস ভাসমান জীবাণুকে তাড়িয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। এরপর থেকে ঘরবাড়ির অভ্যন্তর, বা বাইরে যেখানে মানুষ একসঙ্গে কালাতিপাত করে, সর্বত্র বাতাস চলাচলের দিকটা বাস্তবিকজ্ঞানে গুরুত্ব পেতে থাকল। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে জল ও বাতাসের ভূমিকা মান্যতা পেল। ফ্রান্সে যেমন নগরায়ন এসেছিল তৃতীয় নেপোলিয়ন ও বারঁ ওসমানের হাত ধরে, পাস্ত্যরের হাত ধরে মানুষ শিখল পরিচ্ছন্ন হতে এবং পরিচ্ছন্নতার এক নয়া সভ্যতা প্রবর্তিত হল শুধু ফ্রান্সে নয় শিল্পায়িত সমগ্র বিশ্বে। নাগরিক স্বাস্থ্যবিধির সেই ট্র্যাডিশন আজও সগৌরব অব্যাহত।

উমা

পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক গাড়ি

নন্দগোপাল পাত্র

২০১৭-র অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, আমাদের দেশে গণ-পরিবহনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত যান ব্যবহারের ঝোঁক বাড়ছে। ২০১৬-য় রাস্তা শাসন করছে ২২৯০ লক্ষ গাড়ি এবং ২০১৬-১৭য় শুধু চারচাকার নতুন গাড়ি বিক্রি হয়েছে ৩০ লাখ। এই বিপুল সংখ্যক গাড়ি ডিজেল ও পেট্রোলচালিত হওয়ায় বায়ুতে মিশছে প্রচুর পরিমাণে দূষিত গ্যাস। দেখে নেওয়া যাক, যানবাহনগুলো কতটা পরিমাণে দূষিত পদার্থ নির্গত করে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে নেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দিল্লির এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত ‘ডাউন টু আর্থ’-এ কর্তৃকা গোয়েল দেখিয়েছেন, ৫০টি দুচাকার বাহন, ১৫টি ব্যক্তি মালিকানাধীন চারচাকার ডিজেলচালিত গাড়ি, ১৫টি ব্যক্তি মালিকানাধীন চারচাকার পেট্রোলচালিত গাড়ি এবং ২০টি বাস যথাক্রমে দিনে ২৫, ৫০, ১০০ কিমি চললে একদিনে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পার্টিকুলেট ম্যাটার (২.৫ ও ১০)-এর পরিমাণ এইরকম: কার্বন ডাই-অক্সাইড - ৫০টি দুচাকার বাহন (১০০-২০০ সিসি, ৪ স্ট্রোক) = ২৪.৮২০ গ্রাম/কিমি x ৫০ x ২৫ কিমি = ৩১,০২৫ গ্রাম। ১৫টি চারচাকার ডিজেলচালিত গাড়ি (১৬০০ সিসি, বিএস IV) = ১৪৮.৭৬০ গ্রাম/কিমি x ১৫ x ৫০ কিমি = ৩১,০২৫ গ্রাম। ১৫টি চারচাকার ডিজেলচালিত গাড়ি (১৪০০ সিসি, বিএস IV) = ১৭২.৯৫০ গ্রাম/কিমি x ১৫ x ৫০ কিমি = ১,২৯,৭১২.৫ গ্রাম। ২০টি বাস (৬০০০ সিসি, বিএস IV) = ৬০২.০১ গ্রাম/কিমি x ২০ x ১০০ কিমি = ১২,০৪,০২০ গ্রাম। একদিনে নির্গত মোট কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ = ১,৪৭৬,৩২৭.৫ গ্রাম। পার্টিকুলেট ম্যাটার— ৫০টি দুচাকার বাহন (১০০) = ০.০২৮ গ্রাম/কিমি x ৫০ x ২৫ কিমি = ৩৫ গ্রাম। ১৫টি চারচাকার ডিজেলচালিত গাড়ি (১৬০০ সিসি) = ০.০০৮ গ্রাম/কিমি x ১৫ x ৫০ কিমি = ৬ গ্রাম। ১৫টি চারচাকার ডিজেল চালিত গাড়ি (১৪০০

সিসি) = ০.০০২ গ্রাম/কিমি x ১৫ x ৫০ কিমি = ১.৫ গ্রাম। ২০টি বাস (৬০০০ সিসি) = ০.০৫১ গ্রাম/কিমি x ২০ x ১০০ কিমি = ১০২ গ্রাম। একদিনে নির্গত মোট পার্টিকুলেট ম্যাটারের পরিমাণ = ১৪৪.৫ গ্রাম।

বর্তমান বিধি অনুযায়ী একটি যে কোনো যানের আয়ুষ্কাল ১৫ বছর। ওই ১৫ বছরে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পার্টিকুলেট ম্যাটার যথাক্রমে ১৪৭৬৩২৭.৫ গ্রাম x ৩৬৫ x ১৫ কিমি = ৮০৮,২৮,৯৩,০৬২.৫ গ্রাম এবং ১৪৪.৫ গ্রাম x ৩৬৫ x ১৫ কিমি = ৭৯১১৩৭.৫ গ্রাম নির্গত হবে। এটা অনুমান করা বিশেষ কঠিন হবে না গাড়ির সংখ্যা কয়েকশো মিলিয়ন হলে নির্গত দূষকের পরিমাণ কত হবে। অপরদিকে বিইভি থেকে নির্গত দূষকের পরিমাণ শূন্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় সেরা ২০টি দূষিত শহরের মধ্যে প্রথম ১৪টি ভারতের হওয়ার অন্যতম কারণ বিপুল সংখ্যক জ্বালানি তেল চালিত যানবাহন।

এই দূষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে পরিবহনের প্রতিটি স্তরে বৈদ্যুতিক বাহনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কারণ এটাই একমাত্র বিকল্প। সরকারিস্তরেও বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা বাড়াতে একাধিক সুযোগ ও ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সোসাইটি অফ ম্যানুফ্যাকচারার’স অফ ইলেকট্রিক ভেহিকল সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬-র ৩১ মার্চ বৈদ্যুতিক বাহন বা ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকল (বিইভি) চাহিদা ৩৭.৫% বেড়েছে। বর্তমানে সারা দেশে বিইভি-র সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মতো। তবে চাহিদা বাড়ছে ২০০%-রও বেশি হারে। সেই হিসাবে আগামী পাঁচ বছরে দেশে বিইভি-র সংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। সরকারের পরিকল্পনা ২০৩০-এর মধ্যে সব যানবাহনই হবে বিইভি এবং ২০১৯-এর মধ্যে ১ মিলিয়ন তিনচাকার বিইভি ও ১০ হাজার বিইভি বাস চালানো। বৈদ্যুতিক গাড়িগুলিকে সহজে চিহ্নিত করার জন্য দেওয়া হবে সবুজ নম্বর প্লেট।

বিইভি-তে শক্তি জোগায় ব্যাটারি, এতে জ্বালানি তেল না থাকার জন্য প্রয়োজন হয় না এমন অনেক যন্ত্রাংশ, যার ফলে দৈনন্দিন চালানোর ও মেরামতের খরচ অনেক কম। জ্বালানি তেলচালিত যানবাহন বা ইন্টারন্যাশনাল কমবাশন ইঞ্জিন ভেহিকলের (আইসিইভি) তুলনায় বিইভি-র দাম বেশি, তার কারণ ব্যাটারি প্যাকের উচ্চ মূল্য। ২০১২ পর্যন্ত ব্যাটারি প্যাকের মূল্য ছিল ইউনিট প্রতি ৬০০ ডলার, এখন তা ২৫০ ডলারে পাওয়া যাচ্ছে। যেভাবে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন চলছে, আগামী ২০২৪-এ ১০০ ডলারে পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা যেতে পারে। অতি সম্প্রতি বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার আবিষ্কৃত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে দুচাকা ও তিনচাকার বিইভি-তে। ফলে আগামীতে বিইভি-র মূল্য অনেকটাই কমবে এটা নিশ্চিত। পাশাপাশি আইসিইভি ইঞ্জিন থেকে নির্গত দূষকের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত এগোচ্ছে স্টেজ সিক্সের দিকে, সে ক্ষেত্রে আইসিইভি ইঞ্জিনেরও পরিবর্তন আনতে হবে। যার ফলে আইসিইভি-রও মূল্য বাড়বে। আইসিইভি থেকে নির্গত দূষকের বিধি যত কঠিন হবে, ততই ক্রেতার বিইভি কেনার দিকে ঝুঁকবে। বিইভি-র চার্জিং পরিকাঠামো আমাদের দেশে এখনও ভাল করে গড়ে ওঠে নি। বেঙ্গালুরু, পুনে, নয়ডা, গুরগাঁওতে অনেক অফিস বাড়িতে চার্জিং স্টেশন রয়েছে।

আমাদের রাজ্যে এ ধরনের চার্জিং স্টেশন একটিই রয়েছে, রাজারহাট নিউ টাউনে। চার্জিং পরিকাঠামোসহ বাড়িতে হবে আইসিইভি ব্যবহারকারীদের সচেতনতা ও বিইভি-র দাম সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে। তবেই বাড়বে বিইভি-র চাহিদা; কমবে দূষণ, আমরা থাকতে পারব আরও ভাল।

উমা

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

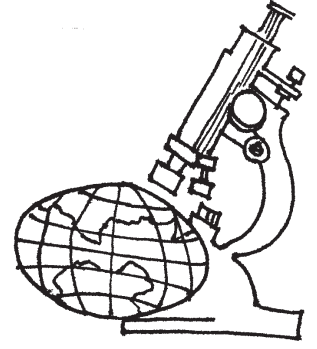
বর্তমান ডাকব্যবস্থার কথা প্রায় সবারই জানা। চিঠি বা কোনো কিছু পাঠালে তা আদৌ প্রাপকের হাতে গিয়ে পৌঁছবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। আমাদের অনেক গ্রাহকেরই, যাঁরা ডাকযোগে পত্রিকা নেন, অভিযোগ, হাতে পত্রিকা পান না। ফলে আমাদের আবার পাঠাতে হয়, হয়ত আবারও। এতে আমাদের যেমন হয়রানি হয়, গ্রাহকেরও। অথচ এ সমস্যার কোনো সমাধান আমাদের হাতে নেই। তাই গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, সুযোগ থাকলে ডাকে না নিয়ে হাতে পত্রিকা নিন।

মেঘনাদ সাহা স্মরণে বাদ-পড়া কিছু কথা

গত অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় ‘আহরণ’-এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মেঘনাদ সাহাকে নিয়ে রাজ্যসভার সদস্য অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখাটি প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রকাশের নেপথ্যে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল, অনবধানে সেটি উল্লিখিত হয়নি, তার জন্য আমরা দুঃখিত। মেঘনাদ সাহা’র জন্ম ৬ অক্টোবর, ১৮৯৩ অধুনা বাংলাদেশের এক অখ্যাত গ্রামে। প্রয়াত হন ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, মাত্র ৬৩ বছর বয়সে। ওঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৯৩-এ সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স সম্মিলিতভাবে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে। তাতেই হীরেনবাবুর এই লেখাটি প্রকাশিত হয়, যা মেঘনাদ-মূল্যায়নের এক অমূল্য দলিল, সমাজ ও বিজ্ঞানচর্চার এক বিশ্লেষণী উপস্থাপনাও। আর একটি কথাও উল্লেখ্য, স্মরণিকায় একমাত্র হীরেনবাবুর লেখাটিই ছিল বাংলায়। আমাদের সদস্য শ্যামল ভদ্র মেঘনাদ সাহাকে নিয়ে গবেষণা-সূত্রে লেখাটি পেয়ে যান। সাহা ইনস্টিটিউট তা মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায় তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। বর্তমানে আমরা এক অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান— সর্বত্র যেন অবিজ্ঞান চর্চার ধুম পড়ে গেছে! প্রজ্ঞা, মেধা ও বৌদ্ধিক সমাজমনস্কতার পরিসরটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। লেখক হীরেন্দ্রনাথের তা নিয়ে আক্ষেপের অন্ত ছিল না— ‘আজকাল মানুষের মন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, মানুষের হৃদয় বলে বস্তু নেই, মানুষের কলজেটা কোথায়, তার কোন ঠিকানা নেই। এরকম একটা ভয়ঙ্কর রাহুর গ্রাসের মধ্যে দিয়ে চলেছে আমাদের সভ্যতা।’ ২৫ বছর আগে প্রকাশিত এই লেখাটি আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে উৎসাহিত করবে বলে আমরা মনে করি। সে কারণেই পুনর্মুদ্রণ।

সম্পাদক

কহি দীপ জ্বলে কহি রঙ



সমীরকুমার ঘোষ

অফিস-ক্যান্টিনে খেতে খেতে শঙ্কর গজগজ করে উঠল, ‘এই কাজের দিদিটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।’ ব্যাপারটা কী! ‘আমাদের কাপড়কাচা যন্ত্র নেই। বালতি করে ভেজালে কাজের দিদিই কেচে ছাদে শুকোতে দেন। দোতলায় ছাদ। বিস্তর দড়ি টাঙানো। ফলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মুশকিল হল, দিদিকে বারবার বলা সত্ত্বেও রঙিন জামাকাপড় ছাওয়ায় না মেলে রোদে দেন, আর তাতেই রঙের বারোটো বেজে যায়। দিদির যুক্তি, জামাকাপড়কে একটু রোদ না খাওয়ালে নাকি রোগজীবাণু মরবে না! আমাদের স্বাস্থ্যচিন্তা করতে গিয়ে দামি জামাকাপড়গুলোর যে বারোটো বাজছে, কে ওঁকে বোঝাবে!’ খানিকটা হতাশই দেখাল শঙ্করকে।

মনে পড়ল, ছোটবেলায় মাকে দেখেছি, আমাদের রঙিন জামা-প্যান্ট কেচে ছাওয়ায় শুকোতে দিত। আর রোদ্দুরে দিলেও উল্টে দিত, যাতে বাইরের দিকটায় রোদ্দুর না লাগে। তাছাড়া একটু ভিজে থাকতে থাকতেই রোদ্দুর থেকে সরিয়ে ছাওয়ায় দিত। নিজের রঙিন শাড়ির ক্ষেত্রও তাই। ফলে আমাদের জামাকাপড় পুরনো হলেও রঙ নষ্ট হত না। নতুনের মতো দেখাত।

শঙ্করের সমস্যাটা শুনে যে প্রশ্নটা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল, তা হল— রঙিন জামাকাপড় কাচার পর রোদে

শুকোতে দিলে সতিই রঙ জ্বলে যায় কেন? রোদ লেগেই যদি রঙ নষ্ট হয়, তাহলে তো রাস্তায় রোদ্দুরে হাটাহাটি করলেও রঙ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। তাই হয় কি?

এই প্রশ্নে ঢোকান আগে রঙের রঙবাজি নিয়ে কিঞ্চিৎ চর্চা করা যাক। স্কুলের পদার্থ বিজ্ঞানের বইতে সকলেই পড়েছি, কালো কোনো রঙ নয়। আর সাদা সব রঙের মিশ্রণ। নিউটন স্ফটিকের মধ্যে দিয়ে সাদা আলো ফেলে দেখিয়েও দিয়েছিলেন সাত রঙ। এছাড়াও জেনেছি, মূল রঙ তিনটে— লাল, সবুজ ও নীল। এই তিনটে রঙ মিশিয়েই

তাবৎ রঙের সৃষ্টি। ইংরেজিতে সংক্ষেপে ‘আরজিবি’ বলে। ক্রমশ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে নতুন তথ্য জানা যেতে লাগল। টমাস ইয়ং নামে এক বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন, আলো চেউয়ের মতো ধেয়ে আসে। এই চেউয়ের দুটো বৈশিষ্ট্য— গতিবেগ, মানে নির্দিষ্ট সময়ে কতদূর যেতে

পারে আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল দুটো চেউয়ের চূড়ার দূরত্ব। রঙ আর কিছুই নয়, আলোর নানা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ মাত্র। ইয়ং তা মেপেও দেখালেন। সে মাপের একক ‘ন্যানোমিটার’। এক মিটারের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগকে বলে ‘মাইক্রোমিটার’। তার হাজার ভাগের এক ভাগ হল ন্যানোমিটার। সেই মাপের নিরিখে আমরা যে আলোর রঙ দেখতে পাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটি ৪০০ থেকে



৭০০ ন্যানোমিটার। ৪০০ থেকে ৪৫০ ন্যানোমিটার হলে রঙটা দেখব বেগুনি, ৪৫০-৫০০ হলে নীল বা আকাশি, ৫০০-৫৭৫ সবুজ, ৫৭৫-৫৯০ হলুদ, ৫৯০ থেকে ৬২০ কমলা, আর ৬২০ থেকে ৭০০ লাল। সাত রঙ ও তাদের ক্রমকে মনে রাখতে ছোটবেলায় শেখা ‘ভিবজিওর’-এর কথা মনে করুন। এর কম বা বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও আছে। তাকে আমাদের চোখ ঠাহর করতে পারে না। যেমন, ৪০০-র নিচে হলে বলে অতিবেগুনি রশ্মি। সূর্যের আলোয় থাকে। আমরা দেখতে না পেলেও চামড়া শুষে নেয়, ক্ষতি হয়। এক্স-রের মাপ ১০-এর নিচে। ওদিকে আবার ৭০০-র ওপরে হলে বলে ইনফ্রা রেড, বাংলায় অবলোহিত রশ্মি। মাইক্রোওয়েভ বা রেডিও তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আবার ৫০ হাজার ন্যানোমিটারের চেয়েও বেশি। সব মিলিয়ে দেখলে এটাই দাঁড়ায়, বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আমাদের চোখে পড়লে মস্তিষ্কে যে সঙ্কেত যায়, তাকেই বলে রঙ। তার কোনোটা লাল, কোনোটা নীল। এটা সাদা আলোকে ভিত্তি করেই বলা হয়। ধরা যাক, জবাবফুলের রঙ লাল। তার মানে তার পাপড়িতে এমন রাসায়নিক পদার্থ আছে, যার ওপর সাদা আলো পড়লে, সে নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রঙ শুষে নেয়, আর লালটাকে শুষে নিতে পারে না বলে প্রতিফলিত করে। সেই প্রতিফলিত আলো চোখে পড়লে আমরা জবাকে লাল দেখি। এই লাল জবার ওপর নীল, সবুজ বা অন্য রঙ ফেললে তাকে আবার কালো দেখাবে। কারণ জবার পাপড়ি লাল ছাড়া অন্য রঙ শুষে নেয়। কোনো আলো ফিরে না আসায় তাকে কালোই দেখব। যে কারণে ঘরে নীল রঙের নাইট ল্যাম্প জ্বাললে সব কিছুই কালো কালো দেখায়। আমরা যাকে রঙ জ্বলে যাওয়া বলি বা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া বলি, তাকে পরিভাষায় বলে ‘ফটোডিগ্রেডেশন’। রঙের মধ্যে আলো শুষে নেওয়ার জন্য রঞ্জক থাকে, তাকে বলে ক্রোমোফোরস। আমরা যে রঙ দেখি, তা এর রাসায়নিক বন্ধনের ওপর নির্ভর করে। মানে সেটা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কতটা পরিমাণ আলো শোষণ করতে পারে ও প্রতিফলিত করতে পারে।

সূর্যের আলোয় যে অতিবেগুনি রশ্মি থাকে, তা রঞ্জকের ভেতরে থাকা রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে দেয়। তার দরুনই রঙ ফিকে হয়ে যায়। পরিভাষায় ‘ব্লিচিং এফেক্ট’ বলে। কিছু জিনিস আছে, যা সহজে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যেমন জৈব রঙে রাঙানো কাপড় বা জলরঙ। অন্য জিনিসগুলো বেশি

পরিমাণ আলো প্রতিফলিত করতে পারে, যার ফলে তারা সহজে ফ্যাকাশে হয়ে যায় না।

পোশাকআশাকের রঙ (ডাই ও পিগমেন্ট) নির্দিষ্ট কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (ওয়েভ লেন্থ) আলোকে শুষে নেয়, বাকিটা ফিরিয়ে দেয়। রঙের অণু আলোর ফোটন কণা শুষে নেওয়ার পর উত্তেজিত হয় পড়ে। তার ফলে বেশ খানিকটা শক্তি (এনার্জি) তৈরি হয়। তার জেরেই শুরু হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া। ভেঙে যায় রঞ্জক কণাগুলো। অণুগুলোর ইলেকট্রন-বিন্যাস বদলে যাওয়ার জন্য তাদের শোষণ ক্ষমতাও বদলে যায়। স্ক্রল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণের প্রবণতা বেড়ে যায়। এই ধ্বংসাত্মক রসায়ন কতখানি হবে তা রঙের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। কোয়ান্টাম ডটস বা অজৈব রঙের চেয়ে জৈব রঙ অনেক দ্রুত বিক্রিয়া করে, অর্থাৎ জ্বলে যেতে পারে।

লাল রঙ দ্রুত ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কারণ এটা স্ক্রল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো, সেই সঙ্গে বেশি এনার্জিও শোষণ করে। যত বেশি এনার্জি শোষণ ততবেশি প্রতিক্রিয়া। অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবও প্রবল। তাই রাস্তাঘাটে যে সব দিক-নির্দেশিকা দেওয়া থাকে, তার ওজ্জ্বল্য যাতে নষ্ট না হয়, ইউডি ঠেকানো আস্তরণ দেওয়া হয়।

রঙ জ্বলে যাওয়া শুধু পোশাকের একচেটিয়া ভাবে ভুল হবে। বাড়িঘর, এমনকি আসবাবপত্রের রঙ নিয়েও একই সমস্যা। এমনকি প্লাস্টিকের রঙিন-চেয়ার টেবিলও রঙ খোয়ায়। বাড়ি বা দরজা-জানলার ওজ্জ্বল্য ধরে রাখতে রঙ কোম্পানিগুলো আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হচ্ছে। এমন রঙ তৈরি করছে, যার অণুগুলো সহজে আলোর সঙ্গে গলাগলি করে না। ফিরি পোশাক আলোচনায়।

কালো রঙ নিয়ে আমাদের খুব মাথাব্যথা। এটা চট করেই ফিকে হয়ে যায়। তা ঠেকানোর কিছু নিদান আছে। যেমন, ঠাণ্ডা জলে কাচা। তারপর দু কাপ কড়া কফি বা চা মিশিয়ে ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। ড্রায়ার রঙ নষ্ট করে দিতে পারে, তাই ছাওয়াই ভাল। ভিনিগার বা নুন মেশানো জলে ভিজিয়ে রাখলেও রঙ চট করে ফিকে হয় না।

জামাকাপড় কেচে রোদ্দুরে দিলে রঙ জ্বলে যায়। রোদ্দুরে হাঁটহাঁটি করলেও রঙ খানিকটা চটে। সেই বিখ্যাত গানের কলি ‘কহি দীপ জ্বলে কহি দিল’-এর মতো বলতে হয় কহি দীপ জ্বলে কহি রঙ।



ফিবোনাচি নয়, পুরোধা হেমচন্দ্র

উৎস মানুষ পত্রিকায় সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় বরুণ দত্তের লেখা ‘ফিবোনাচি ও তার রহস্য সংখ্যা’ পড়ে ভাল লাগল। এই সংখ্যার শ্রেণী ও তার বিন্যাসে প্রকৃতিসৃষ্ট গাছ, পাতা, ফুল ও কাণ্ডের গঠনের আশ্চর্য সাদৃশ্য অবাক করে দেয়। বিষয়টা উল্লেখ করা জরুরি, তার কারণ লিয়নার্দো ফিবোনাচি-সংখ্যা বা শ্রেণীর প্রয়োগ বা আবিষ্কার ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে। আর ভারতীয় পণ্ডিত আচার্য হেমচন্দ্র এই সংখ্যা বা সংখ্যামালার প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দে। কে এই হেমচন্দ্র? তিনি ছিলেন গুজরাটের চালুক্য রাজসভার সভাপণ্ডিত, দর্শন ও গণিতশাস্ত্র বিশারদ। প্রাচীন তথ্য থেকে জানা যায় যে, এই ধরনের সংখ্যা, সংখ্যার বিন্যাস ভারতীয় দর্শন ও সঙ্গীতচর্চায় বিভিন্ন রূপে প্রয়োগ করা হত।

আরো জানা যায়, ইতালীয় পণ্ডিত ফিবোনাচি তাঁর সময়ে ভারতীয় গণিতচর্চার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অথচ কোথাও তার উল্লেখ করেননি। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত গণিতের অধ্যাপক বেশ কিছু ভারতীয় বিষয়টিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক মঞ্জুল ভার্গবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ভার্গব বর্তমানে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি কয়েক বছর আগেই গণিতের সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘ফিল্ড মেডেল’ পেয়েছেন। এই পুরস্কারকে নোবেল-এর সমতুল্য ধরা হয়। মঞ্জুল ভার্গব আচার্য হেমচন্দ্রের কাজ যে ভারতীয় সঙ্গীত ও কাব্যগীতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত, তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। বর্তমানে এই অঙ্কের শ্রেণী হেমচন্দ্র-ফিবোনাচি সংখ্যা বা শ্রেণী নামে পরিচিত। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বইতে এভাবেই উল্লেখ করা হচ্ছে। তবলার তাল যে হেমচন্দ্র-ফিবোনাচি

সংখ্যার ক্রম অনুযায়ী চলে, অধ্যাপক ভার্গব তাও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। উস্তাদ তবলাচির কাছে তালিম নিয়েছেন। বর্তমানে হেমচন্দ্র-ফিবোনাচি সংখ্যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর ‘বিজ্ঞানের ইতিহাস’ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৩) সমরেন্দ্রনাথ সেন উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিভিন্ন সংখ্যা ও দর্শমিক স্থানাঙ্কের প্রয়োগ সম্পর্কে আরবদের উল্লেখ করে থাকেন। অথচ বহুদিন পর্যন্ত এই ভুলের সংশোধন হয়নি। এর কারণ, আরবদের বহুপূর্বে হিন্দু সংখ্যার কথা যে ইউরোপে পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং বলে দেওয়া যায় যে, আচার্য হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও আক্ষরিক অর্থে এই সত্যই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

শ্যামল ভদ্র

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

ফি বছর বর্ষা মানেই বন্যা। বন্যা নিয়ে এর আগে আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বন্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই সমসময়কে ধরে উৎস মানুষ প্রকাশ করল নতুন সঙ্কলনগ্রন্থ।



বিজ্ঞানকে ভালবাসতে শেখাবে

বিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি গল্প • আশিসকুমার দাশগুপ্ত • প্রকাশক
ঋতাক্ষর • দাম ১৫০ টাকা

বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় নিয়ে গল্প বলা সহজ কাজ নয়। আর তা বাংলায় হলে তো কথাই নেই! লেখক আশিসকুমার দাশগুপ্ত সেই কাজটি বেশ মুনশিয়ানার সঙ্গে করেছেন। অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞানের বেশ খটমট বিষয়কে প্রাঞ্জল গদ্যে লিখে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। বর্তমানে এ ধরনের প্রয়াস বড় একটা দেখা যায় না।

আলোচ্য বইটির প্রথম পর্বে রয়েছে, অঙ্ক নিয়ে সাতটি গল্প আর দ্বিতীয় পর্বে পদার্থবিজ্ঞানের গল্প। বইটির ভূমিকায় লেখক তাঁর ছোটবেলা থেকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণের কথা বলেছেন। ঠিকই। বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞান ও ভালবাসা না থাকলে গল্পের ঢঙ ওভাবে লেখা যায় না। পাঠকের মনে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি ভালবাসা তৈরি করতে এ বই যে সাহায্য করবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রথম পর্বের শুরুর লেখা অঙ্ক নিয়ে— ‘সেতু পারাপারের অঙ্ক’। রাশিয়ায় কোনিগসবার্গ শহরটি প্রেগেল নদীর দুদিকে প্রশস্ত আর মাঝখানে রয়েছে দুটি দ্বীপ। যোগাযোগের জন্য রয়েছে সাতটি সেতু—যেগুলির অবস্থান এক জ্যামিতিক বিশ্বয়! আশিসবাবু এই সেতু-সমষ্টির জ্যামিতিক তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে লিখছেন, স্থলভাগে যাতায়াতের জন্য সবসময় দুটি সেতু পার হতে হত। এই ধাঁধার সমাধানে লেওনার্ড অয়লার অঙ্কের এক নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, যা গ্রাফ থিয়োরি নামে পরিচিত। পাঠকের বোঝার সুবিধের জন্য লেখক স্থানীয় ইতিহাস জুড়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের গল্পটি ফিবোনাচি শ্রেণী সম্পর্কে। যার সঙ্গে আবার দা-ভিঞ্চি কোডে-এর রহস্য উন্মোচনের সম্পর্ক রয়েছে। লিয়নার্দো ফিবোনাচি এক ইতালীয় গণিতশাস্ত্র বিশারদ। যাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই শ্রেণী থেকে জন্ম নেওয়া একটি আনুপাতিক সংখ্যা যা গোল্ডেন রেশিও বলে পরিচিত। প্রাচীন গ্রিসের সভ্যতা থেকে আধুনিক যুগের স্থাপত্যকলার বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন কাজকর্মে এই শ্রেণীর প্রয়োগ নিয়ে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে। আরো আছে— ‘ট্যান্সির নম্বরের গল্প’, ‘পাতার কোণে অঙ্ক’— এমনই সব মজার নাম দিয়ে আরো কিছু গল্প রয়েছে। ‘এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কারের খোঁজে’ তাতে

অসীম সংখ্যারশির মধ্যে একটি অংশ হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার-এর বিন্যাস। এই মৌলিক সংখ্যাগুলো নিজেদের মতো করে সংখ্যার শ্রেণীতে পাওয়া যায়, এদের নিয়মে বাঁধা খুবই মুশকিল। আশিসবাবু লিখেছেন, ‘মৌলিক সংখ্যাদের এই বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা আনার একটি ধাপ হল রীমান হাইপোথিসিস। এখানে কম্পিউটারে এনক্রিপশন-র বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে - কিভাবে তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে সমষ্টিগতভাবে মৌলিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। এই পর্বের শেষে অঙ্কের ফিল্ডস মেডেল এবং আবেল পুরস্কার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে যা, অঙ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করা হয়।

বইটির দ্বিতীয় পর্বে সাতটি লেখা পদার্থবিদ্যা বিষয়ে। প্রথমটি তাপগতিবিদ্যার (থার্মোডায়নামিক্স) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এনট্রপি— বিজ্ঞানীরা কীভাবে এ বিষয়ে ধাপে ধাপে আলোকপাত করলেন তা সুন্দর গল্পের ছলে লিখেছেন।

আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$ এমসি স্কোয়ার আমরা প্রায় সকলেই জানি। শক্তি, পদার্থের ভর ও আলোর গতিবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত। পদার্থের ভেতরে যে অফুরন্ত শক্তি (এনার্জি) লুকিয়ে আছে, তা পরমাণু কেন্দ্রের স্থায়িত্বের কারণ। অর্থাৎ প্রবল কেন্দ্রীয় বল। বিজ্ঞানীরা কীভাবে বিভিন্ন বল বা ফোর্স সমন্বয়ের গবেষণায় ব্যস্ত, লেখক তা উল্লেখ করেছেন। ভূতুড়ে কণার গল্প বলেছেন। রয়েছে নিউট্রিনো আবিষ্কারের কাহিনী এবং পরীক্ষাগারে এই কণার স্তিত্বের উপলব্ধির কথা। এইভাবেই হিগস-বোসনের কথাও এসেছে, যার সাফল্যের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। লেখক অনায়াসেই পাতালপুরীর কর্মযজ্ঞ বর্ণনা করেছেন।

জেনেভাতে সার্ন-এর লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে (এলএইচসি) মাটির নিচে বিভিন্ন মৌলিক কণার সম্বর্ষের ফলে নতুন নতুন সব তথ্য জানা যাচ্ছে। এসবের হদিশ পাওয়া যাবে বিজ্ঞানের গল্পে। পরের প্রসঙ্গ এসেছে আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব নিয়ে। ভারি সুন্দর ছন্দে লেখা হয়েছে। যেমন: স্পেস-টাইম থিয়োরি বলছে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নীরব নয় বরং বিভিন্ন স্পন্দনরত শক্তির মধ্যে সে সজীব।

স্পেস-টাইম কম্পনের মধ্যে যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে তুলনীয় গভীর অরণ্যে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ অথবা ভাগনার অপেরার সুরের মূর্ছনা। যা আমরা এতদিন শুনতে পাইনি। ব্রহ্মাণ্ড আসলে একটি সঙ্গীতসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র, যাকে আমরা এতদিন নির্বাক চলচ্চিত্র হিসেবে দেখে এসেছি। বইটিতে বিষয় আত্মস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের স্বাদও যে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্যামল ভদ্র